দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা

শ্রী ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায় এম,এ

প্রণীত ও সম্পাদিত

১৩৩৪

শ্রীভূপতিনাথ সরকার

সঙ্কল্পিত

ও

সঙ্কলিত

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক—

বি, এন, সরকার এণ্ড কোং।

২০ নং ট্যাংরা রোড, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস,

১৪ নং জগন্নাথ দত্তর লেন, কলিকাতা।

সঙ্কল্প।

৫/২৭

• দুঃসাহসের নির্লজ্জ খড়্গে আলস্যাদি নানা বাধা বিঘ্নের কণ্টক ছেদন করিয়া আমরা দ্বিধাসঙ্কোচের গুরুভার মাথায় বহিয়া কম্পিত হৃদয়ে শীঘ্রই পাঠক পাঠিকাগণের দ্বারে উপস্থিত হইতে চলিয়াছি। এই অবসরে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে এই সঙ্কল্প আমাদের "দক্ষিণেশ্বর-তীর্থযাত্রার" সঙ্কল্প—"তীর্থে পূজা" আমাদের সঙ্কল্পিত কার্য্য নহে, উহা নিত্যপূজা। নৈমিত্তিক পূজায় দোষ ত্রুটীর জন্য কর্ম্মীকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, আর নিত্য কর্ম্মে অপরাধের অবকাশ নাই সেই ভরসায় আমরা কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি।

সে আজ অনেকদিনের কথা। বর্ত্তমান লেখক তখন ছাত্র। এবং বর্ত্তমান সঙ্কলয়িতা বা প্রকাশকের সহিত তখন তাঁহার পরিচয়ই ছিল না। সেই সময়কার কোন এক নির্জ্জন মুহূর্ত্তে এই লেখকের মনে Philosophy of Sree Ram Krishna অর্থাৎ 'শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে প্রতিফলিত দর্শনশাস্ত্র' আলোচনা করিয়া বঙ্গভাষায় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার দুরাশা বা স্পর্দ্ধা আপনি কোথা হইতে উদয় হয়। তাহার পর এযাবৎ বামনের পর্ব্বত লঙ্ঘন তুল্য সেই দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না গিয়া লেখক বুদ্ধির কাজই করিয়াছেন,—কেননা ঐ বিষয়টী এত উচ্চভাব ভূমির সামগ্রী যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা সম্যক উপলব্ধি না হইলে অর্থাৎ সিদ্ধ মহাপুরুষ না হউন বুদ্ধিমার্গের কৃতী সাধক

ব্যতীত আর কেহ ঐ মহতী ভাবধারার বিচারই করিতে পারিবেন না—সুবিচার ত দূরের কথা।

এদিকে ইতিমধ্যে সঙ্কলয়িতা বা প্রকাশক মহাশয়ের দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে সাময়িক বসবাসে এবং কর্ম্ম ও প্রবৃত্তিসূত্রে ঠাকুর বাটীর সহিত ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার মনে দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত একখানি পুস্তিকার অভাব দূরদেশাগত যাত্রিগণের পক্ষ হইতে অনুভূত হয়। আমাদের মত বঙ্গদেশীয় সন্নিকটবাসী ব্যক্তিগণের যাহা পুরাতন জানাকথা; প্রবাসী বঙ্গবাসী বা বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ ভিন্নদেশবাসী ভক্তের পক্ষে তাহাই হয়ত নূতন জানিবার কথা।

এই সময়ে সম্প্রতি সঙ্কলয়িতা মহাশয়ের সহিত লেখকের পরিচয়ের গণ্ডী পার হইয়া সদ্ভাব স্থাপিত হইয়া গেল। তাহার অনতিকাল পরেই প্রকাশক মহাশয় আপনার অনুভূত অভাব পূরণের মাল মশলা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া সেগুলি যথাস্থানে সংযোজন ও সম্পাদনের ভার লেখকের উপর ন্যস্ত করিলেন। লেখকও তাহার পূর্ব্ববর্ণিত স্পর্দ্ধা বা দুরাশার এখানে আংশিক ও একদেশীয় ছায়াপাত হইতে দেখিয়া স্বেচ্ছায় কর্ম্মভার গ্রহণ করিল। প্রকাশকের সংগ্রহের ও লেখকের স্থাপত্যের পরিচায়ক এই যে কর্ম্মের ফলটী আজ সাধারণ্যে উপস্থাপিত করা যাইতেছে তাহা একখানি কুটীর মাত্র; কেহ সেখানে প্রাসাদের আশা করিলে আশাভঙ্গের দুঃখ পাইবেন; তবে এই কুটীরে কণামাত্র শান্তি মিলিলেই কর্ম্মী যুগল কৃতার্থ হইবে।

নূতন চক্ষে পুরাতনকে দর্শনকরা মানুষের স্বধর্ম্ম তাহার নবীনতা যতদিন না শুকাইয়া লুপ্ত হয়। সেই নবীনতার উচ্ছ্বাসই

আবার প্রবীনের নিকট অনর্থক পাগলামি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা এই পুস্তিকায় সেইরূপ একটু পাগলামি করিয়াছি; জ্ঞান, বুদ্ধি ও বয়সে প্রবীন যাঁহারা তাঁহারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আমরা করিয়াছি এই যে—গ্রন্থকার সাধারণতঃ তাঁহার পুস্তককে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া আপন বক্তব্যকে যথা সম্ভব সকল দিক দিয়া আলোচনা করেন; আমরা কিন্তু আমাদের এই পুস্তিকার পরিচ্ছেদগুলিকে "পরিচ্ছেদ" না বলিয়া তাহাদের অভিনব নামকরণ করিয়াছি :—

প্রথমাংশে ১। সঙ্কল্প—নিবেদন।
২। তীর্থযাত্রা—ভূমিকা।

দ্বিতীয়াংশের "তীর্থে পূজায়" :—

১। আচমন—সূচনা।
২। আবাহন—গ্রন্থাভাস।
৩। আসনশুদ্ধি—ভৌগোলিক বিবরণ।
৪। ভূতশুদ্ধি—অতীত ইতিহাস।
৫। ধ্যান—ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত।
৬। জপ—ঠাকুরের সাধক জীবন ও পরবর্ত্তীকাল।
৭। পাদ্যঅর্ঘ্য—দক্ষিণেশ্বরের বৈষয়িক ব্যবস্থা ও অবস্থা।
৮। প্রণাম—ঠাকুরের জীবনে প্রতিফলিত দর্শনশাস্ত্র।
৯। মার্জ্জন মন্ত্র—পরিশিষ্ট।
১০। বিসর্জ্জন—উপসংহার।

আমাদের এই বিচিত্র অধ্যায়গুলি হিন্দুর পূজাপদ্ধতির প্রচলিত ক্রমমাত্র; তবে উহাদের পর্য্যায় আমরা আমাদের সুবিধামত

স্থির করিয়া লইয়াছি এবং উহাদের পারম্পর্য্য পুস্তকপাঠেই, আশা করি, অবগত হওয়া যাইবে। এই সঙ্গে লেখকের নিজস্ব নিবেদন এই যে—স্থান এবং সুবিধার অভাবে "প্রণাম" অধ্যায়টীকে সংক্ষেপে সারিতে গিয়া বোধহয় ক্ষুদ্রকে বৃহতের আধার করিয়া নিজেও অতৃপ্ত রহিলাম এবং পাঠকপাঠিকাগণকেও তৃপ্তি-দান করিতে পারিলাম না। তবে আশাকরি, শ্রীভগবান্ কৃপা করিলে অদূর ভবিষ্যতে এই তৃপ্তি লাভ ও প্রদান করিতে পারিব।

এখন সকৃতজ্ঞচিত্তে আমরা স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তিকা প্রণয়ন ব্যাপারে আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত পঠিত বিদ্যার উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে—তাহা কি সঙ্কলনে, কি সম্পাদনে। লক্ষ্যে, অলক্ষ্যে যাঁহাদের প্রণীত পুস্তকের সাহায্য আমরা লইয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। সেই মহাজনগণের গতি লক্ষ্য করিতে না পারিলে আমাদের অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইত। আমাদের এই পুরোগামিগণের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পবিত্র নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" ব্যতিরেকে এই পুস্তিকার "ধ্যান" ও "জপ" অধ্যায় লেখা সম্ভবপর হইত না। উপরোক্ত গ্রন্থরত্ন হইতে যেখানে অবিকল আহরণ করিয়াছি সেখানে উদ্ধৃত করণের চিহ্ন (" ") সহযোগে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু তদ্ব্যতীত উক্ত অধ্যায়দ্বয়ের অন্যান্য স্থানে স্বামিজীর বিতরিত জ্ঞানের প্রভাব এবং সংস্কার আমাদিগকে আলোক দান করিয়াছে। এই সূত্রে স্বামিজীর এবং বেলুড় মঠের পরিচালক সমিতির (Managing

Committeeর) চিরপূত আশীর্ব্বাদ ও কৃপা তাঁহাদের অনুমোদন-রূপে লাভ করিয়া আমরা ধন্য ও চরিতার্থ হইয়াছি। তাঁহাদের দুর্লভ শ্রীচরণে এই সুযোগে আমাদের উভয়ের পক্ষ হইতে আমি অসংখ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এমন অবসর আর হইবে না। অতএব এই সঙ্গে আমাদের এই পুস্তিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া যে মহামনাগণ আমাদিগকে উৎসাহিত ও কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের অনাবিল কৃতজ্ঞতা ও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমরা আমাদের নিবেদন সম্পূর্ণ করি। ইতি ১৮৪৯ শকের শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি।

অবশেষে পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট নিবেদন এই যে, মুদ্রনের সময় যথোচিত তত্ত্বাবধানের অভাবে পুস্তকখানিতে কয়েকটী ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় নিম্নে লিখিত হইতেছে। ১৬ পৃষ্ঠায় মুণ্ডমালা স্থলে মুক্তমালা, ২৬ পৃষ্ঠায় খেরাজী স্থলে খেরাজ, ৩০ পৃষ্ঠায় উনসত্তর স্থলে উনষাট, এবং ঐ পৃষ্ঠায় পুত্রবধূও স্থলে পুত্রবধূর, ৩৬ পৃষ্ঠায় নিষ্ঠুর স্থলে নিষ্ঠর, ৪৮ পৃষ্ঠায় গদাধর স্থলে গদাধরের, ৯৪ পৃষ্ঠায় কাণ্ডারী স্থলে কাণ্ডারা, ১০৯ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ স্থলে বিবেকান্দ, ১২৪ পৃষ্ঠায় অপারগতা স্থলে অপারগতায়। ১২৭ পৃষ্ঠায় অসম্পূর্ণ স্থলে অসংম্পূ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকস্থলে বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে সেগুলি পাঠের পক্ষে বিশেষ বিঘ্নদায়ক হইবে না বলিয়া কোনরূপ স্বতন্ত্র শুদ্ধি-পত্র-সংযোজিত হইল না। আশা করি ২য় সংস্করণে পুস্তকখানি নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইবে।

জয়নগর
২রা ভাদ্র ১৩৩৪। } শ্রীভূপ মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

প্রথম অংশ

১। তীর্থযাত্রা ১

দ্বিতীয় অংশ

তীর্থে পূজা

২। আচমন ৩
৩। আবাহন ৫
৪। আসন শুদ্ধি ৯
৫। ভূত শুদ্ধি ২
৬। ধ্যান ৪২
৭। জপ ৬২
৮। পাদ্যঅর্ঘ্য ১০১
৯। প্রণাম ১১৪
১০। মার্জ্জন মন্ত্র ১৩৭
১১। বিসর্জ্জন ১৪১

উপহার

কে

প্রদত্ত হইল

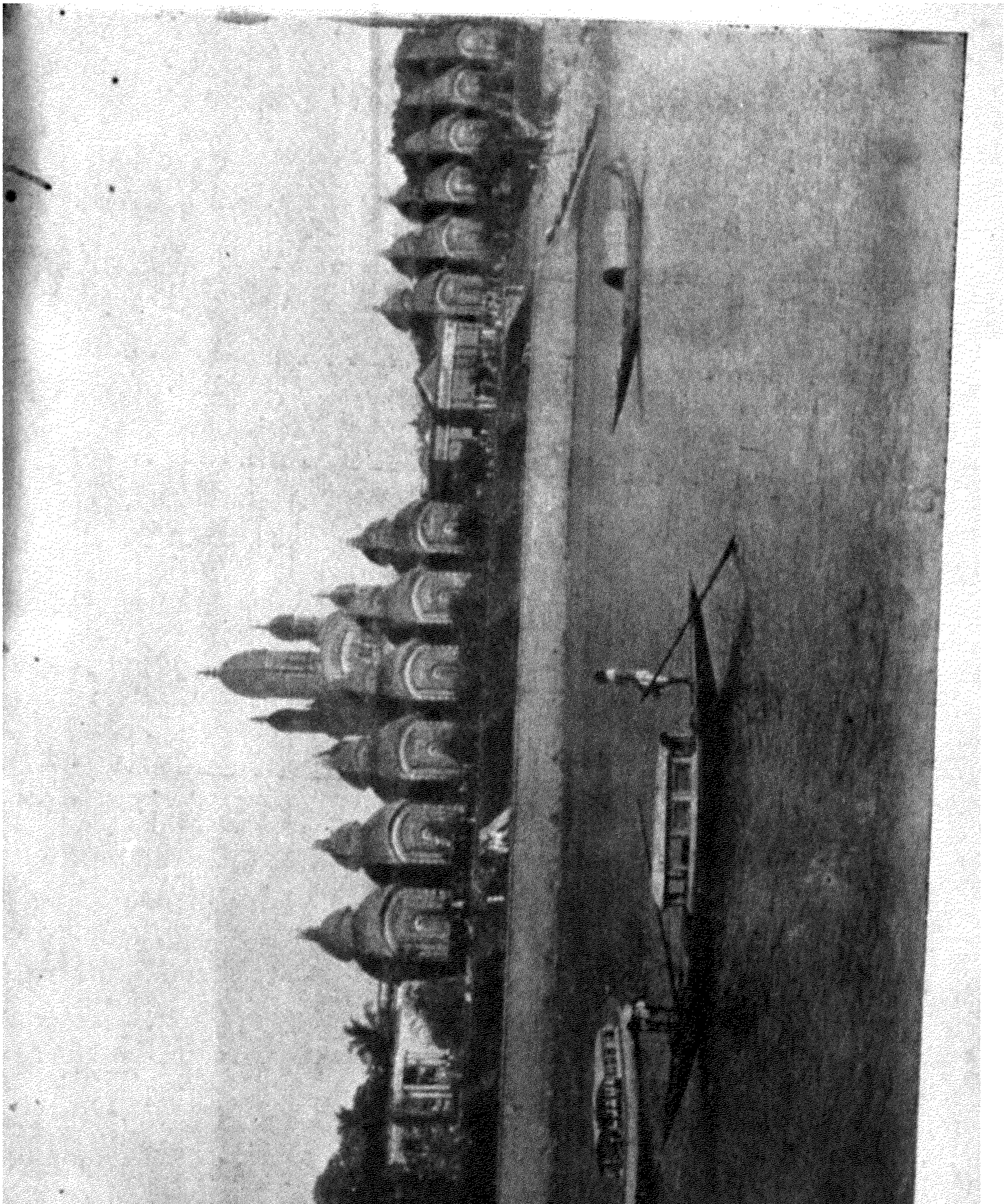

দক্ষিণেশ্বর তীর্থ যাত্রা

তীর্থ যাত্রা।

কালাকাল বিচার, দিন ক্ষণ দেখা পাথেয় সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাথমিক অনুষ্ঠান যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়। যাত্রা সুরু হইলে, থাকে মাত্র যাত্রার মূল সঙ্কল্প এবং উদ্দেশ্য। সঙ্কল্প ইঞ্জিনের মত যাত্রাকে অবিরাম চালাইয়া লইয়া যায়, এবং চলার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দেশ্যটি ফুটিত কমল কোরকের মত আপনি ফুটিয়া উঠে। তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় নিচয়ের সাহায্যে তীর্থক্ষেত্রের সহিত আপনাকে পূর্ণমাত্রায় মিশাইয়া দেওয়ার বাসনাই তীর্থযাত্রার মূল সঙ্কল্প। তীর্থক্ষেত্রে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণে আনুষ্ঠানিক পূজার মধ্য দিয়া আন্তরিক আত্মনিবেদনই তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য।

এই আমরা দক্ষিণেশ্বর পুণ্যতীর্থে যাত্রা করিলাম—আমাদের সাধু সঙ্কল্পই আমাদিগকে লইয়া চলিবে—

"অতীত যা তা দুঃখের স্মৃতি ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর" তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা বর্ত্তমানের সেবক, আমরা চলিতেই থাকিলাম। আমাদের বাকী রহিল তীর্থে দেবারাধনায় আত্মনিবেদন। সেই পূজায় পুরোহিত আমাদের মন; নৈবেদ্য আমাদের অহঙ্কার এবং গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত দাক্ষণেশ্বরের তীর্থগৌরবই আমাদের এ পূজার উপচার। পূজা সিদ্ধ হইবে কি না তাহা জানি না। পূজা শেষে কৃপালব্ধ আনন্দের আমরা অধিকারী হইব কি না কৃপাময়ই জানেন, "সকলই তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি" তবে

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং ॥"

তাই আমরা তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া পূজায় বসিতেছি :—

"সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥"

জয়নগর

১লা বৈশাখ ১৩৩৪

তীর্থে পূজা।

আচমন।

দক্ষিণেশ্বরের তীর্থ গৌরবই আজ দক্ষিণেশ্বরকে পরম আদরের বস্তু করিয়াছে। আজ যে সহস্র সহস্র ভাবুকের কৌতুহল দৃষ্টি এই দক্ষিণেশ্বরেই একান্তভাবে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এ যে স্থান মাহাত্ম্য—ইহার মূল সূত্র যেখানে সেখানেই ইহার তীর্থত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। দক্ষিণেশ্বর বাংলার তীর্থ—বাংলা ভারতবর্ষের তীর্থ, ভারত পৃথিবীর তীর্থস্থান। এই সিদ্ধান্ত একটি নির্ভীক সত্য; অন্তঃসার শূন্য অহমিকা-নহে। যে সত্য উপলব্ধিতেই পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করিতেছে—তাহা এই হৃতসর্ব্বস্ব, পরপদদলিত, পর-নির্ভর দরিদ্র ভারতেরই সাধনলব্ধ নিজস্ব অনুভূতি। সেই অনুভূতিই আবার বাংলার স্বল্পজীবি দুর্ব্বলচিত্ত কলহপ্রিয় সত্যভ্রষ্ট সন্তানদিগেরই রক্তমাংসের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত—তাই একদিন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতলায় গঙ্গার ঘাটে, বেলতলায়, ঠাকুর বাটীর উত্তর পশ্চিম কোণের ঘরটিতে বা তাহার গোল

বারান্দায় সেই অমোঘ সত্যটি অমন করিয়া বিশ্ব-গ্রাসের ক্ষুধা লইয়া যজ্ঞাগ্নির মত হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সে হোমকুণ্ডে আহুতির কোন অভাব ভবিষ্যতে ঘটিবে কি না বলা কঠিন—তবে সেই অগ্নিহোত্রই যে সমগ্র পৃথিবীর অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগের স্বধর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ পোষণ করিবার অবকাশ কোথায়? উপনিষদের যে বাণী, শ্রীমদ্ভাবদগীতার যে বাণী, বাইবেল কোরাণের যে বাণী, এক কথায় পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মমতের যে সত্যবাণী তাহাই একদিন দক্ষিণেশ্বরে উদ্গীত হইয়াছিল। সমন্বয়, এই শব্দটি উক্ত বাণীর প্রতীক। সমন্বয় পৃথিবীর লক্ষ্য, সমন্বয় ভারতের মূলাধার, সমন্বয় বাংলার বীজ, সমন্বয় দক্ষিণেশ্বরের দান—তাই দক্ষিণেশ্বর "জাতীয় সিদ্ধপীঠ" সমন্বয়ের ঋক্ বহুবার বহুকণ্ঠে ভারতে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে এবং বাংলা সেই মন্ত্রে সিদ্ধ। তাই সেদিন ঐ মহামন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে এমনভাবে ধ্বনিত হইল যে, এখন জগতের প্রত্যেক নরনারী আপনার সংস্কার ও সংগতি মত উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে।

স্বপ্রকাশ শাশ্বত সত্যসুন্দর নিত্যমুক্ত শুদ্ধবুদ্ধ স্বভাব। যতক্ষণ না তিনি নামরূপের মায়াবন্ধনে

ধরা দেন, ততক্ষণ আমাদের কাছে তিনি সৎচিৎ আনন্দ মাত্র; আর ধরা দিলেই তিনি আমাদের ধর্ম্মরূপী নেতা তাই তাঁহার সমন্বয়ের রূপ এতদিন যাহা শাস্ত্র-বাণী ছিল তাহাই ত দক্ষিণেশ্বরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রকট হইল, এখন-ধর্ম্মের কথা :—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।"

আবাহন।

জাতির সার্ব্বজনীন তীর্থ দক্ষিণেশ্বর, এই তীর্থের সনাতন বাণীর প্রতীক হইতেছে সমন্বয়—সেই অপৌরুষেয় বাণীর দ্যোতক ছিলেন বা আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। সেই দ্যোতনা অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও সাধু, নাগ মহাশয় প্রমুখ গৃহী, মন্ত্রমুখে সমগ্র ভাবজগতে উদ্দ্যোতিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দক্ষিণেশ্বরের কথা বলিতে গিয়া এখন পৃথিবীর মোক্ষপথের নবীন পথ প্রদর্শক বা মুক্তিযজ্ঞের প্রধান হোতা শ্রীরামকৃষ্ণকেই স্মরণ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তিনি অবতার কিংবা অবতার

নহেন সে মীমাংসা আমাদের প্রতিপাদ্য নহে। তবে তিনি যে একজন মানুষ ছিলেন সে বিষয়ে তর্ক না করিয়া একমত হওয়া বোধহয় বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। তিনি মানুষের মত মাতৃগর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়া আহার নিদ্রা অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি মানুষের কর্ম্ম করিয়া মানুষের মতই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অদ্ভুত অমানুষিক কখনও কিছু করেন নাই—পশুভাবও কখনও তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার বংশের রীতিনীতি অনুসারেই তিনি দেবদেবীর পূজাদি করিয়াছেন এবং তাঁহার দেহান্তে হিন্দুসন্তানের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, অতএব একথা অতি সহজে ও নির্ভয়ে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, তিনি একজন সত্যকার মানুষ ছিলেম। এই খাঁটি মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে জীবনধারা আদর্শ হইতে বাস্তবে নামিয়া আসিয়াছে সেই একটিমাত্র মানবজীবনের জন্য আজ দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বর। সকল প্রকার মানবীয় বিচিত্র ভাবরাশি যেন অসংখ্য নদ নদীর মত আপনাদের স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া ঐ একটি জীবনে মিশিয়া ধন্য হইয়াছে। কোনটি নিজেও ব্যর্থ হয় নাই, অপরকেও করে নাই।

কোন পথ কোন মত কোন ভাব সেখানে বঞ্চিত হইয়া নিরর্থক হয় নাই।

আরও যখন মনে হয় যে, এই মানুষটির জীবনের কোনখানে অমানুষিক কিছু নাই তখন দক্ষিণেশ্বরকে তীর্থ বলিয়া বরণ করিয়া লইতে আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণ যেন আন্তরিকতার অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যতই পশ্চাত্তাপ পাইয়া থাকুন পরমহংসের পঞ্চভৌতিক দেহের যে সৎকার করা হইয়াছিল তাহা খুবই সমীচীন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিংবা তিনি যে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত রোগে ভুগিয়া কষ্ট পাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা না হইলে যেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরামকৃষ্ণত্বের লাঘব হইত, সেই জন্মগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া খেলাধূলা, পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা, বিবাহ, সাংসারিকতা জীবনের অভিজ্ঞতা দেহান্ত ও দেহের শেষ কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্তই সাধারণ মানুষের মত কেমন পর পর ঘটিয়াছে, ও কাটিয়াছে সত্য যাহা তাহা ফুটিয়াছে, যাহা অসত্য তাহা আপনি পড়িয়া গিয়াছে। একেবারে বালকটির মত যে খেলাধূলা তিনি করিলেন তাহাতে তাঁহাকে কোন অবান্তর অভ্যাস স্পর্শই করিল না বা পাঠা-

ভ্যাসের ব্যবস্থায় তিনি যে শিক্ষা পাইলেন তাহা আধুনিক কুশিক্ষা ও অশিক্ষাকে কেমন অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মটীকেই ফুটাইয়া তুলিল। অর্থো-পার্জ্জন করিলেন টাকা ও মাটিকে অভেদজ্ঞান করিয়া, বিবাহ করিয়া সহধর্ম্মিণী পাইলেন, কাম-গন্ধ শূন্য হইয়া সংসার পাতিলেন, মোহ মুক্ত হইয়া আবার নিত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কেমন সলিল জীবন যাপন করিয়া অল্পের সীমা পার হইয়া ভূমার অসীমে চলিয়া গেলেন।

দক্ষিণেশ্বর বেদান্তের জীবন্তরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে। গীতার ও বৈদিক উপনিষদ সমূহের রক্ত মাংসের সংস্করণ, জগৎকে উপহার দিয়া তীর্থ হইয়াছে। মানুষে এই যে সত্যকার গণতান্ত্রিকতার সম্ভবপর বিকাশ ইহাই বাংলার মাটীর বিশেষত্ব। ভগবৎলীলাকে এমন ভাবে মানিয়া লইয়া কায়মনো-বাক্যে গ্রহণ করা বাংলার নিত্য সম্পদ। হয়ত এই জন্যই বাংলার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রবল থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহা বাংলার উপর অবিদ্যামায়ার প্রভাব সম্ভূত সাধন পথের বাধা মাত্র। বাংলাকে বিদ্যামায়ার সাহায্যে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া

দক্ষিণেশ্বর প্রবর্ত্তিত পথে আত্মস্থ হইতে হইবে। দক্ষিণেশ্বরের যাহা উপহার, বাংলার যাহা নিত্য সম্পদ সেই সার্ব্বজনীন মিলন মন্ত্রই আত্মস্থ ভারতের পক্ষে বিশ্বমানবকে একমাত্র দেয় বস্তু। আজ আমরা তাই নবযুগের পুণ্য পীঠস্থান দক্ষিণেশ্বর তীর্থ বাসের সঙ্কল্প করিয়া এই মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করিতেছি। দেখি যথার্থ তীর্থ দর্শন অদৃষ্টে ঘটে কিনা। আমাদের সম্বল এবং সামর্থ্য এতই অল্প যে মধ্য পথে বিকলাঙ্গ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে পড়িয়া থাকাই আমাদের কর্ম্মফলের উচিত পুরস্কার। তবে কলির নাম মাহাত্ম্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া আমরা "দক্ষিণেশ্বর" নাম লইয়া চলিব ঐ নামে আমাদের পথের সকল কাঁটা ধন্য হয়ে গোলাপ হয়ে ফুটে উঠবে" এই ভরসা।

আসন শুদ্ধি

দক্ষিণেশ্বর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। কলিকাতার উত্তরে ইহা অবস্থিত। কলিকাতা মহানগরীর উত্তর সীমানা টালা, টালার উত্তরে কাশীপুর, কাশীপুরের উত্তরে বরাহনগর, বরাহনগরের উত্তরে আলমবাজার এবং আলমবাজারের উত্তরে দক্ষিণেশ্বর। কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরের দূরত্ব সার্দ্ধ দুইক্রোশ বা পাঁচ মাইল।

দক্ষিণেশ্বর স্রোতস্বিনী ভাগিরথীর পূর্ব্ব দিককার একখণ্ড তীরভূমি বলিলেও চলে। অতএব দক্ষিণেশ্বরের পশ্চিমে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার প্রবাহ, দক্ষিণে আলমবাজার, পূর্ব্বে রাজপথ এবং উত্তরে এড়িয়াদহ গ্রাম।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামখানি সুদূর অতীতকাল হইতেই উপরোক্ত চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানেই অবস্থিত ছিল। তবে ঐখানে স্বর্গীয়া রাণী রাসমণি প্রশস্ত একখানি বাগান ক্রয় করিয়া তথায় ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যখন উক্ত ঠাকুর বাটীতে সিদ্ধ হইলেন তাহার পর হইতে দক্ষিণেশ্বর বলিতে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ঐ ঠাকুর বাটীকেই বুঝায়। এই দেবালয় ও তৎসংলগ্ন ফল ফুলের বাগান, পুষ্করিণী সমেত অনূান ৫৪।৷০ সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা জমি হইবে। এই স্থানটি দক্ষিণ দিকে যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পরেই ৺যদুনাথ মল্লিকের বাগানবাটী (যাহা বর্ত্তমানে Railway Company ক্রয় করিয়াছেন) ও তৎপার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাটী। পূর্ব্বদিকে রাজপথের ধারে ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিকের বাগানবাটী এবং উত্তর সীমার বাহিরে ইংরাজ সরকারের বারুদখানা। বর্ত্তমানে উহা উঠিয়া যাওয়ায়

তাহার বাটীখানিও তৎসংলগ্ন স্থান পড়িয়া রহিয়াছে। ঠাকুর বাটীর পশ্চিম প্রান্তে বহমানা গঙ্গার গর্ভ হইতে বহু অর্থব্যয়ে পোস্তা গাঁথাইয়া নির্ম্মাণ করা হয়, এক্ষণে সেইজন্য কলুষনাশিনী ভাগীরথী আপনার বিচিত্র বীচি-মালায় ইহার পশ্চিম গাত্র নিরন্তর ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন যে কলুষনাশিনী জাহ্নবী আপনার উভয় তীরস্থ ভূমিখণ্ডগুলির গায়ে আপন মোহিনী মায়ায় তুলি বুলাইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে—সেই সুরধুনী এখানে নিরুদ্বেগ প্রসন্ন হৃদয়া জননীর মত নব্য বাংলার এই সনাতন তীর্থটীকে শান্তি ও প্রীতির সম্পদে সমধিক সমৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতার গঙ্গার মত এখানে নব-সভ্যতার নিষ্ঠুর পরিহাস পবিত্র স্রোতস্বিনীর উপরে সেতু, নৌকা ও নানাবিধ পোতাদিরূপে বর্ষিত হইয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে সকল রকমে খর্ব্ব করে নাই। এখানে সুন্দরকে কুৎসিতের আঘাত সহ্য করিতে হয় না। পূর্ব্বে এইস্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল না। তৎকালে দর্শনেচ্ছু মধ্যবিত্ত ভক্তগণ প্রায়ই কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদব্রজেই যাতায়াত করিতেন। অধুনা সামান্য অর্থব্যয়ে জলপথে

বড়বাজার ঘাট হইতে ষ্টীমার যোগে, এবং স্থলপথে শ্যামবাজার মোড় হইতে মোটরবাস যোগে, কলিকাতা হইতে যাত্রী সাধারণ বিনাক্লেশে এবং অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে পঁহুছিতে পারেন। নদীবক্ষে নৌকারোহণে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত তখন বেশ চলন ছিল, এখন সে ব্যবস্থার অন্য কোন বিপর্য্যয় না ঘটিলেও উপরোক্ত নিরাপদ নব উপায়ের প্রবর্ত্তনে নৌকায় যাইবার রীতি অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে, তবে বেলুড় হইতে উৎসবাদির সময় ভক্তবৃন্দ মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরিয়া যান। সম্প্রতি বেলুড়ে ষ্টীমার ঘাট হওয়ায় যাত্রী সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সার্দ্ধ একঘণ্টাকাল অন্তর বড়বাজার হইতে শিবতলায় (দক্ষিণেশ্বরে) ষ্টীমার যাতায়াত করে, দেবালয়ের উত্তরে আড়িয়াদহ নামক স্থানে শিবতলা ষ্টীমারঘাট, এই স্থান হইতে অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে আসিলে দেবালয়ে পৌঁছান যায়। ভবিষ্যতে বালি হইতে প্রস্তাবিত গঙ্গার সেতু নির্ম্মিত হইয়া যাইলে দেশান্তরের দক্ষিণেশ্বরের যাত্রীগণের আরও সুবিধা হইবে।

এইবার আমরা যদি সত্যকার দক্ষিণেশ্বর অর্থাৎ

দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ের একটী বাচনিক আলেখ্য প্রদান করিতে চেষ্টা করি তবে সে ছবি পাঠক পাঠিকাগণ স্বীয় কল্পনার সাহায্যে নিজ নিজ অন্তরে সুন্দরতর করিয়া ফুটাইয়া লইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। প্রথমেই আমরা বলিয়া রাখি যে "শ্রীমঃ" লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রথম ভাগ কালীবাড়ীর প্রাঞ্জল এবং সম্পূর্ণ একটি বর্ণনা আছে। পুণ্য সলিলা ভাগীরথী বক্ষে নৌকা করিয়া কালীবাড়ীতে পঁহুছিয়া নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিলে যেরূপ দেখা যায়, ঐ পুস্তকে সেইরূপ বর্ণনাই বিশদ ভাবে করা হইয়াছে। ইহাতে মনে আছে আমরা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই তখন আমার প্রধানতঃ একমাত্র উক্ত পুস্তকেই দক্ষিণেশ্বরের সহিত পরিচিত হওয়ায় এবং গৌণতঃ গঙ্গার মনোহর দৃশ্যদর্শনের লোভেও উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইয়াও ঘুরিয়া গঙ্গার ঘাটে প্রথমে যাই, সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে সকল দ্রষ্টব্যস্থানগুলি যথাসাধ্য দেখিতে থাকি। আজকাল নৌকাযোগে যাতায়াতের প্রথার সেরূপ প্রচলন না থাকায় যাত্রীগণকে উত্তরদিকের দ্বারেই

প্রথমে আসিতে হয়। সে কারণ আমরা ঠাকুর বাড়ীর অমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও উত্তরদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া একটি চিত্র দিবার দুঃসাহসের কার্য্য করিতেছি।

কলিকাতা হইতে যে রাজপথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছে তাহার উপর একটি এবং শিবতলা হইতে কালীবাটিতে যে রাস্তা গিয়াছে তাহার উপর আর একটি রাণী রাসমণির বাগানের পূর্ব্ব সীমানায় এই দুইটি প্রবেশ দ্বার আছে। উভয় দ্বার হইতে দুইটি বিভিন্ন শুরকীর রাস্তা আসিয়া উত্তর দ্বারে শেষ হইয়াছে এবং সেখান হইতে পথটি ঘুরিয়া পশ্চিমদিকে ভাগীরথীর তীর ধরিয়া পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বরাবর মধ্যে চাঁদনী অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ সীমায় নহবৎঘরের নিকট শেষ হইয়াছে। গোলাকার মহোচ্চস্তম্ভ বিশিষ্ট উত্তরদ্বার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিলে পূর্ব্ব পশ্চিমে দুইটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায়, উহা দ্বাররক্ষকদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট। এই দেউড়ী অতিক্রম করিলে উত্তর দক্ষিণে লম্বা প্রস্তর-ফলকাচ্ছাদিত পাকা উঠানের পশ্চিমে নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত দ্বাদশটি শিব মন্দির ছয়টি করিয়া

দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ী (ভিতর দৃশ্য)

উত্তর দক্ষিণে বিভক্ত ও সজ্জিত। মধ্যে সুবৃহৎ চাঁদনী, এই চাঁদনী হইতে পশ্চিমাস্য হইয়া বিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া গঙ্গার পুণ্য সলিলে অবরোহণ করিতে হয়। ইহাই যাত্রীগণের স্নান আহ্নিকের ঘাট এই ঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্নানাদি জলসেবা করিতেন। ভাগীরথীর উপকূলস্থ সুগঠিত ইষ্টকনির্ম্মিত পোস্তার উপর করবী, রমন, বেল, জবা, প্রভৃতি পুষ্পের উদ্যান। এই চাঁদনী কালীবাটীর গঙ্গার দিককার প্রবেশদ্বার। চাঁদনীর ঠিক সম্মুখে পূর্ব্বদিকে ৺জগন্মাতার মন্দিরে উঠিবার সোপানাবলি এবং মন্দিরের ঐ দিকেও একটি পশ্চিমমুখী দ্বার থাকায় বিদেশীয় অহিন্দু পর্য্যটকগণের চাঁদনী হইতে মন্দিরাভ্যন্তর দেখিবার সুবিধা হয়। উক্ত সোপান ব্যতীত অপর একটি নাতিদীর্ঘ সোপান ৺মাতার ও তদীয় নাটমন্দিরে উঠিবার সুবিধা করিয়াছে। উক্ত সোপান বহিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া উঠিলে দক্ষিণে ৺মাতার নাটমন্দির ইহার ভিতর সাধারণে সঙ্কীর্ত্তন ও পূজা হোমাদি করিয়া থাকেন, বহুতর সুউচ্চ গোলাকার মসৃণ স্তম্ভ ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। ইহার ভিতর ভক্তপ্রবর রাসমণির জামাতা মথুরবাবু ধান্য মেরু করিয়াছিলেন, এবং এইখানেই পরমহংসদেব সর্ব্ব সমক্ষে কুমারী পূজা করিয়াছিলেন। নাটমন্দিরের

সম্মুখভাগে ছাদে উত্তরাস্ত হইয়া শ্রীশ্রীমহাদেব ভৈরব মূর্ত্তি, নন্দী ও ভৃঙ্গীসহ বিরাজমান। পরমহংসদেব ৺মাতার দর্শন করিতে যাইবার কালে যোড়হস্তে ইঁহাদের প্রণাম করিয়া তবে মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। নাট-মন্দিরের দক্ষিণে একটি বাঁধান চতুষ্কোণ স্থানের উপর হাড়িকাঠ। নাটমন্দিরের উত্তরে ৺মাতার 'নবরত্ন' মন্দির। মন্দিরের নয়টি চূড়া এবং মন্দির গাত্র সুন্দর কারুকার্য্য সুশোভিত। মন্দিরের শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তরাবৃত তলদেশের মধ্যস্থলে কৃষ্ণ মর্ম্মরের সোপানযুক্ত উচ্চ বেদিকার উপরে রৌপ্য সিংহাসনোপরি রজতময় সহস্রদল পদ্ম তাহার উপর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত শিব শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ান আছেন, তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী চেলী পরিহিতা, বিচিত্র অলঙ্কার ভূষিতা, মাতৃস্নেহ বিগলিত নয়না অবিদ্যানাশিনী মনোরমা শ্যামা মা, শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুঞ্জরী, পঞ্চম, পাঁজের, চুটকী অগ্রহাতে বালা নারিকেল ফুল পঁইচে, বাউটি, মধ্যহাতে তার দোদুল্যমান ঝাঁপা সমেত তাবিজ, গলদেশে চিক, মুক্তার মালা, সোনার বত্রিশ নর মালা, তারা হার ও সুবর্ণ নির্ম্মিত মুক্তমালা, মস্তকে সুবর্ণ মুকুট নাসিকায় নৎ নোলক দেওয়া, কানে

কানপাশা ফুল ঝুমকো, চৌদানী ও মাছ, মায়ের বামহস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তে বরাভয়, কটিদেশে নরকর মালা। মন্দিরাভ্যন্তরে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে তিনটি দ্বার আছে, এবং উত্তর পশ্চিম কোণে উপর তলে উঠিবার ঘোরান সিড়ি আছে। মন্দিরের মধ্য প্রকোষ্ঠে মাতৃ প্রতিমার পূর্ব্বদিকে সুদৃশ্য খাটের উপর সুসজ্জিত বিশ্রাম শয্যা, কৃষ্ণ প্রস্তর বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাস, পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতু নির্ম্মিত সিংহ, পূর্ব্বে গোধিকা ও ত্রিশূল, বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে বৃষ, ঈশান-কোণে হংস, বেদীতে উঠিবার সোপানোপরি ক্ষুদ্র সিংহাসনারূঢ় নারায়ণ শিলা এবং এক পার্শ্বে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতু নির্ম্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহমূর্ত্তি, বেদীর সম্মুখে ঘটস্থাপনা করা হইয়াছে, বেদীর নিম্নে মায়ের মুখ প্রক্ষালনের জন্য তামার ঝারি এবং কৃষ্ণ প্রস্তরের বেদীর উপর শ্রীশ্রীসিদ্ধিদাতা গণেশ বিরাজিত, বেদীর চারিকোণে রৌপ্যময় স্তম্ভবিশিষ্ট মঞ্চ, তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ। ৺মাতার মন্দিরের উত্তরে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর মন্দির, মর্ম্মরাবৃত মন্দিরতল মধ্যে পশ্চিমাস্য

হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। রৌপ্য সিংহাসনোপরি কষ্টীপাথর নির্ম্মিত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও অষ্টধাতুময়ী শ্রীমতী রাধারাণী, মন্দিরাভ্যন্তরে যুগল মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে উহাদের পোষাক পরিচ্ছদাদি সংরক্ষিত করিবার জন্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। গর্ভ মন্দিরের সম্মুখে শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তরাবৃত বারান্দা আছে, বারান্দার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গঙ্গাজলের জালা, ৺মাতার মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরেও ভিতরকার চৌকাঠের নিকট সুরভিত শ্রীচরণামৃত তাম্রপাত্রে রক্ষিত দ্বারে দ্বারী দ্বার রক্ষা করিতেছে, শ্রী শ্রীভবতারিণীর ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে তাঁহাদের নিজ নিজ ভোগঘর, বিষ্ণুঘরের ভোগ নিরামিষ ও জগদম্বার ঘরের আমিষ ভোগ স্বতন্ত্র পাক হইয়া থাকে। ঐ ভোগঘরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে দেবালয়ের ভাণ্ডার ঘর, উহার পার্শ্বে একটি ছাদে উঠিবার সোপান আছে, ভাণ্ডার ঘরের কিছু পশ্চিমে বর্ত্তমানে সন্দেশ মিষ্টান্নাদি খাবারের দোকান, তাহার পশ্চিম গাত্রে পূর্ব্বোক্ত দেউড়ী, ঐ দেউড়ীর পশ্চিমধারে অর্থাৎ ঠাকুর বাটীর উত্তর পশ্চিম কোণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ঘর, উহার পশ্চিমে অর্দ্ধগোলাকৃতি সুপরিচিত বারান্দা।

ঘরের ভিতর পরমহংসদেবের শয়ন ও বিশ্রাম শয্যা রহিয়াছে, এবং তাঁহার প্রিয় নানাপ্রকার দেব দেবীর পট টাঙান আছে, ঐসকল অতীব সুন্দর এবং বর্ত্তমানে উহা সচরাচর দেখা যায় না, ঠাকুরঘরের উত্তর বারান্দায় দেওয়ালে ঠাকুরের স্বহস্ত অঙ্কিত পুষ্পবৃক্ষ অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর বাটীতে প্রবেশ করিবার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বে তিনটি প্রবেশ দ্বার আছে ও পশ্চিমে চাঁদনীর ভিতর দিয়া প্রবেশ করা যায়, উহার কোন কপাট নাই, ৺মাতার মন্দির ও নাট মন্দিরের মধ্যে পূর্ব্বদিকে যে প্রবেশ দ্বার আছে উহার পূর্ব্বদিকে সানবাঁধান স্বচ্ছ জল বিশিষ্ট 'গাজীপুকুর' নামক পুষ্করিণী, উক্ত দেউড়ীর দক্ষিণদিকে পাচক, টহলদার, ভাণ্ডারী প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের বসত ঘর। এইদিকেও ছাদে উঠিবার একটি সিঁড়ি আছে, ইহার পশ্চিমদিকে সেবাইৎ, রিসিভার প্রভৃতির বসিবার ঘর, পুনরায় মধ্য পথে দক্ষিণ দেউড়ী, উহার পশ্চিমে দপ্তরখানা। ঠাকুর বাটীর উত্তর দক্ষিণে বিবিধ ফুল ও সুরস ফলের বাগান এবং গঙ্গার তীরে উত্তর দক্ষিণে দুইটি নহবৎখানা যেন সীমা রক্ষার প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। পরমহংস-দেবের ঘরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একটি পথ বরাবর

উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, পরমহংসদেবের ঘরের কিছু উত্তরে যে নহবৎখানা পাওয়া যায় তাহার নিম্ন তলের ঘরে তাঁহার পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী থাকিতেন, উহার উত্তর পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের স্নান ঘাট, ঘাটের উপরে সুবৃহৎ বকুলবৃক্ষ, নহবৎখানার ঠিক পূর্ব্বে সেবাইৎগণের বিশ্রাম ভবন কুটীবাড়ী, বকুলতলার ঘাট ছাড়াইয়া আরও উত্তরে যাইলে "পঞ্চবটী" ও পরমহংসদেবের "শান্তিকুটীর" দেখিতে পাওয়া যায়, কুটীর মধ্যে ধ্যানস্থ শিবমূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার পশ্চিমদিকে ঠাকুরেরই স্বহস্ত রোপিত বটবৃক্ষ, তলদেশ সুন্দররূপে বাঁধান, তদুপরি শিবলিঙ্গ বিরাজমান। উক্ত বৃক্ষের উত্তরে অপর একটি বাঁধান বটবৃক্ষ উহার উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পরমহংসদেব ধ্যান ধারণা করিতেন। পঞ্চবটির পূর্ব্বদিকে "হাঁসপুকুর," উত্তরে ঝাউতলার উত্তর পূর্ব্ব কোণে "বেলতলা," বেলতলার দক্ষিণে আস্তাবল ও গোশালা এই দিকে পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যতর প্রবেশদ্বার। এই সকলের দক্ষিণে অনেক জমী লইয়া বিবিধ ফলের বাগান ; মধ্যে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, উহার দক্ষিণে অপর একটি সিংহদ্বার এবং উহার দক্ষিণে পুনরায় ফলের বাগান। দেবালয়ের পূর্ব্বে আলম-

বাজার হইয়া কলিকাতা যাইবার সদর ফটক ও পথ, উত্তর পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য গ্রাম ও ষ্টীমারঘাটে যাইবার পথ।

ভক্তের পূজার ত্রুটির অবকাশ নাই। তাই আমরা নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, দীনের যেমন পূজা সেইরূপ আয়োজন ত হইবেই। তাহা বলিয়া পূজার অধিকারে বঞ্চিত হই কেন? তবে প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা ভক্ত কি না? তাহারও উত্তর এই যে—ভক্ত অনেক প্রকার। তন্মধ্যে নিকৃষ্ট ভক্ত হইতে বাধা কি? অথবা বাধা থাকিলেই বা; কণ্টক আছে বলিয়া যেমন পদ্ম সংগ্রহ নিবারিত হয় না, সেইরূপ বাধা আছে বলিয়া 'আমরা ভক্ত' এই এতবড় গৌরবকে ক্ষুন্ন হইতে দিব কেন? এই সত্য-সিদ্ধান্তের প্রেরণায় আমরা এখানে আমাদের "আসন-শুদ্ধি" শেষ করিলাম।

ভূত শুদ্ধি

আমাদের এ পূজা পদ্ধতির পরিগৃহীত ক্রম অনুসারে "আসনশুদ্ধির" পর "ভূতশুদ্ধি"। আমরা এতক্ষণ দক্ষিণেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থানটি পাঠক পাঠিকা-

গণের মনোফলকে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা তাঁহারাই জানেন। এখন আমরা দক্ষিণেশ্বর কি ছিল অর্থাৎ এই গ্রামটির তথা দেবালয়ের অতীত্ব সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব। এখন স্মৃতিদেবী আমাদের পথ প্রদর্শিকা। দেবী স্মারকতা সঞ্চিত পূর্ব্বের কথা, অঞ্চল সম্পুটে বাঁধা যাঁর তিনি এখন কৃপা না করিলে আমাদের আর চলিবার উপায় নাই। অতএব আমাদের চলিতে পারা না পারার জন্য তিনিই দায়ী, আমাদের তাহাতে কোন দুঃখ বা অপরাধ নাই। এই ভরসা সম্বল করিয়া আজ আমাদের যাত্রাপথের সুরু।

আমাদের দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল স্থানেরই পুরাতন ইতিহাস গবেষণা সাপেক্ষ। আর এইরূপ কোন গ্রাম বা জনপদের পূর্ব্বকথা জানিতে হইলে প্রধানতঃ কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহার পরে যদি কোন পুরাতন কীর্ত্তির অবশেষ বা ঐ রূপের অন্য কোন নিদর্শন মিলিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে অবলম্বন করা বহুলাংশে নিরাপদ তর।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সহিত অনেক পুরাতন স্মৃতি

বিজড়িত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। শুনা যায় পূর্ব্বে কয়েক শতাব্দী হইল এখানে বান রাজার অনেক কীর্ত্তি ছিল, অদ্যাবধি আরিয়াদহ ষ্টিমার ঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী "বুড়াশিব" সেই কীর্ত্তির ক্ষীণ রশ্মিটিকে মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মত রক্ষা করিতেছেন। অধুনা এই বুড়া শিবের নামানুসারে ষ্টিমার ঘাটের নাম "বুড়াশিবতলা" হওয়ায় নির্ব্বাণোন্মুখ দীপটীর জীবনকাল কথঞ্চিৎ তৈলধারা লাভে তবুও একটু বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

হয়ত এই বানরাজার সময়ের পর বাংলার নবাবী আমলের প্রবর্ত্তন হয় তখন হয়ত সেই স্বনামধন্য রাজার কীর্ত্তিকলাপ একে একে লোপ পাইয়া এই দক্ষিণেশ্বর একটী গোরস্থানে পরিণত হয়। কালের ফুৎকারে কেমন করিয়া এক একটি দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া প্রোজ্জ্বল দীপশিখা শকুন শৃগালের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হইল তাহার ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র "গাজিতলা" নামক কোন অজ্ঞাত গাজী সাহেবের পীরের স্থান এখন সেই কবর ভূমির লুপ্ত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া হিন্দু ঘরের বিধবার মতন জীবন ধারণ করিতেছে।

ইহার পর বাংলার ইংরাজ আমল, ইংরাজ বস্তুতান্ত্রিক

এবং ইহকাল সর্ব্বস্ব। তাই ইংরাজের কীর্ত্তি ভোগসুখের সুব্যবস্থাতেই স্বপ্রকাশ। দক্ষিণেশ্বরের ইংরাজ কীর্ত্তি জেমস্ হেষ্টি সাহেবের কুঠীবাড়ী, এই কুঠীবাড়ী এখন দেবালয়ের সেবাইৎগণের কুঠীতে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি ইংরাজ হেষ্টি সাহেব দক্ষিণেশ্বরে কুঠীবাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বসবাস করিতেছিলেন তাহার পর রাণী রাসমণি তাঁহার কুঠী-সমেত এই দেবালয়ের সমগ্র জমী ক্রয় করিয়া দেবালয় নির্ম্মাণ করিলেন এবং কুঠীটিকে সংস্কার করিয়া আপনা-দের বিশ্রামাগারে পরিণত করা সত্ত্বেও উহার পুরাতন ঢং একেবারে নির্ম্মূল করেন নাই।

১২৫৫ সালে স্বনামধন্যা রাণী রাসমণি বহুকাল নিরবচ্ছিন্ন বিষয়কর্ম্মের পর অবিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্রে গমন করিয়া তীর্থবাস করিবার সংকল্প করেন। যাত্রার পূর্ব্বকালীন আয়োজন সমাধা করিয়া তীর্থযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাত্রিতে রাণী স্বপ্নে ৺জগন্মাতার দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন যে—"কাশী যাইবার আবশ্যকতা নাই, ভাগীরথী তীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর "কেহ বলেন, রাণী তীর্থযাত্রা

করিয়া নৌকায় দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত আসিলে নৌকায় রাত্রিবাসকালে স্বপ্নে ঐ রূপ প্রত্যাদিষ্ট হয়েন। স্বপ্নকে কোন অলৌকিক ঘটনা মনে করিবার প্রয়োজন নাই—কেন না স্বপ্ন দর্শন প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যকার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং স্বপ্নকালে আমাদের মন বিষয়মুক্ত হইয়া অনেক সময় স্বচ্ছন্দগতিতে যে বিচরণ করে, তাহা আমরা সকলেই অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি। এই যুক্তি বলেই আমরা রাণী রাসমণির উক্ত রূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

বলাবাহুল্য, স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশ হিন্দু রমণী রাসমণি দৈবাদেশ জ্ঞান করিলেন এবং সেই আদেশ পালনই যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা তাঁহার অন্তরাত্মা মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। রাণী প্রথমে "গঙ্গার পশ্চিমকুল বারাণসী সমতুল" এই চির প্রচলিত সংস্কারবশে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি পরিচিত ও অপরিচিত গ্রামে ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণোপযোগী স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সকল গ্রামের ভূস্বামিগণ নিজ নিজ অধিকৃত স্থানের কোথাও অন্য কাহারও ব্যয়ে নির্ম্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ

করা অবস্থা ও বংশ মর্য্যাদার হানিকর বিবেচনায় রাসমণির কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য করিলেন না। কাজে-কাজেই রাণী পরিশেষে বাধ্য হইয়া পূর্ব্বকূলে এই (বর্ত্তমান কালীবাড়ীর) স্থানটি ক্রয় করিলেন। রাণীর মনোনীত স্থানের কিয়দংশ পূর্ব্বোল্লিখিত হেষ্টী সাহেবের কুঠী ছিল এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরভূমি ও গাজি সাহেবের পীরের স্থান ছিল। সমগ্র ভূমিটীর কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল, ঐরূপ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তি প্রতিষ্ঠার ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট।

অতএব ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জেমস্ হেষ্টি সাহেবের কুঠী ও তৎসংলগ্ন ভূমি সমেত সাড়ে চুয়ান্ন ৫৪৷৷৹ বিঘা খেরাজা জমী (৪২৫০০) বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা মূল্যে ক্রয় করিলেন। তৎপরে তিনি আপন কল্পনা ও সৃষ্টিকৌশলের প্রেরণায় দেবালয় নির্ম্মাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই দেবালয় নির্ম্মাণে একজন সাধারণ বঙ্গরমণী নিজ কল্পনাবলে ও সহজ বুদ্ধিতে পূর্ত্ত ও স্থাপত্যশিল্পে যে পারদর্শিতা ও সৃজন পটুতা দেখাইয়াছেন তাহা উল্লেখের অযোগ্য নহে। এই সাধারণ বঙ্গ কুলবধূটির একটু

বিস্তৃততর পরিচয়ও এখানে নিতান্ত অশোভন বা অবান্তর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

রাণী রাসমণি একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। কলিকাতা মহানগরীর উত্তরে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরস্থিত হালিসহরের সন্নিকটবর্ত্তী কোনা নামক একটি গণ্ডগ্রামে ১২০০ সালের ১১ আশ্বিন তারিখ (ইংরাজী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে) রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস এবং মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। রাসমণির দুই সহোদর ছিল। অনেক সাধ্য সাধনার ফলে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার স্নেহময় জনকজননী তাঁহাকে আদর করিয়া "রাণী" বলিয়া ডাকিতেন রাসমণির পিতা ৺হরেকৃষ্ণ দাস বাঙলা লেখাপড়া সামান্য জানিলেও সহৃদয়তা ও কর্ম্মতৎপরতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। মাতাপিতা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগী ছিলেন বলিয়া বালিকা রাসমণিতেও ঐরূপ ভগবদনুরক্তি পরিলক্ষিত হইত। রাসমণির বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র তখন তাঁহার স্নেহশীলা জননী দেহত্যাগ করেন। রাসমণি হরেকৃষ্ণের প্রৌঢ়াবস্থার একমাত্র সন্তান। তিনি শ্রমজীবি ছিলেন কায়িক পরিশ্রমলব্ধ সমস্ত অর্থই

গ্রাসাচ্ছাদনে ব্যয়িত হইত। পত্নীর স্বর্গারোহণের পর হরেকৃষ্ণ একমাত্র কন্যা রাসমণিকে পাত্রস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। অনূঢ়া রাসমণির বালিকা বয়সের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইখানেই সাঙ্গ হইতে চলিল কিন্তু নারী জীবন পিতৃপরিচয়ে পূর্ণ মাত্রায় জানা যায় না, তাহার অপরার্দ্ধ শ্বশুর ও স্বামীতে আবদ্ধ। নারীর জীবনধারা স্রোতস্বতীর ন্যায় পিতা ও শ্বশুর উভয় কুলের ব্যবধানেই আপন অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। অতএব আমরা এখন রাসমণির পাত্র অনুসন্ধানছলে যথা সময়েই তাঁহার শ্বশুর গৃহে চলিয়াছি।

কোনা গ্রামে যখন হরেকৃষ্ণদাস তাঁহার রাণীমাটীকে সৎপাত্রে দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার সংকল্প করিতে-ছিলেন। তখন কলিকাতার জানবাজারের মাহিষ্য ধনকুবের প্রীতিরামদাস তাঁহার বারবার বিপত্নীক দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্রদাসের পুনরায় তৃতীয়বার বিবাহ দিয়া নূতন পুত্রবধু গৃহে আনিবার সংকল্প করিতেছিলেন।

পলাশী যুদ্ধের চারিবৎসর পূর্ব্বে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দরিদ্রের গৃহে প্রীতিরামের জন্ম হয়। বাল্যে তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে

১৪ বৎসর বয়সে মাতৃপিতৃহীন বালক প্রীতিরাম, রামতনু ও কালীপ্রসাদ নামে দুই সহোদরকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার জানবাজারের তদানীন্তন বিখ্যাত জমিদার স্বজাতীয় মান্নাবাবুদের পুরস্ত্রী পিতৃস্বষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে থাকিয়া সামান্য ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া (ফোর্ট উইলিয়ম) কেল্লার ইংরাজ সৈন্যের রসদ যোগাইবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে প্রীতিরাম নাটোর রাজ-সরকারে এক বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে সঞ্চিত অর্থসহ প্রীতিরাম নাটোর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া আশ্রয়দাতা মান্না পরিবারের যুগলমান্নার একাদশবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জানবাজারে কয়েকখানি বাড়ী ও ১৬ বিঘা জমি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। প্রীতিরামের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হরচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজচন্দ্র ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হন। তৎকালে প্রীতিরাম বারূন কোম্পানী নামক বণিক্‌দলের মুৎসুদ্দি পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নাটোর মহারাজের অধিকারস্থ কয়েকটী

পরগণা লাটে উঠিলে প্রীতিরাম ৬৯০০০ উনষাট হাজার টাকা মূল্যে মুকিমপুর পরগণার জমীদারী ক্রয় করেন। প্রীতিরামের কনিষ্ঠ সহোদর তাঁহাদের এই নবাধিকৃত জমিদারী হইতে কাষ্ঠ, বংশ ও মৎস্য প্রভৃতি তাঁহাদের বেলিয়াঘাটা আড়তে চালান দিতে আরম্ভ করিলেন। বংশসমূহ মাড় বাঁধিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া হইত বলিয়া, বংশাদির ব্যবসায়ী প্রীতিরাম তখন হইতে মাড় আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েন এবং তাঁহার বংশকে পরে লোকে মাড় বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। প্রীতিরাম তাঁহার পুত্রদ্বয়কে তৎকাল সুলভ সামান্য বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ দিলেন সেই বৎসরের মধ্যেই রাজচন্দ্রের স্ত্রী বিয়োগ হইলে তিনি পর বৎসর পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দেন—সে পুত্রবধূর বিবাহ বৎসরেই গতায়ু হন। প্রীতিরামের বক্ষে ভগবান সেই বৎসরেই কঠিনতর শেল নিক্ষেপ করিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র হরচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেন। নূতন পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে সংসারী করিয়া এবং শূন্য সংসার পূর্ণ দেখিয়া দারুণ পুত্রশোক ভুলিবার আশায় সম্ভবতঃ প্রীতিরাম রাজচন্দ্রের জন্য পাত্রী অন্বেষণ

করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। সেই প্রেরিত ব্যক্তি একদিন হালি সহরের জাহ্নবীতীরে একটি সর্ব্বসুলক্ষণা-ক্রান্তা গৌরবর্ণা সুশ্রী বালিকাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিহিতা দেখিয়া বিধাতার অজ্ঞাত অথচ অব্যর্থ ইঙ্গিতে কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন। তিনি সকল পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকেই রাজচন্দ্রের ভাবী পত্নী মনোনীত করিয়া রাণী নামধারিণীকে যথার্থ রাণী করিয়া দিবার জন্য ভদ্রলোকটি নিমিত্ত মাত্র হইয়াই যেন আসিয়া-ছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে একাদশবর্ষ বয়সে রাসমণির রাজচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। অতঃপর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে প্রীতিরাম বর্ত্তমান পারিবারিক আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং সার্দ্ধ ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ৬৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। প্রীতিরামের জীবদ্দশাতেই পদ্মমণি ও কুমারী নাম্নী দুইটী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজচন্দ্র পিতৃ ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে তামার চাদর, কস্তুরী, অহিফেন, নীল প্রভৃতি দ্রব্য বিলাতে রপ্তানী করিতে লাগিলেন। রাজচন্দ্র বানিজ্যদক্ষ ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। তিনি

 5358

নীলামে ২৫০০০৲ টাকার অহিফেন ক্রয় করিয়া সেই দিনই ৭৫০০০৲ টাকা লাভ করেন। ২০৷২৫ হাজার মুদ্রা তাঁহার দৈনিক লাভ ছিলই, তাহার উপর এইরূপ প্রচুর অর্থও মধ্যে মধ্যে লাভ হইত। পিতৃ বিয়োগের বৎসরেই রাজচন্দ্রের তৃতীয় কন্যা করুণাময়ী ভূমিষ্ঠ হয়। পর বৎসরেই রাজচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে করুণাময়ী একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে রাজচন্দ্র পর বৎসর কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার সহিত করুণাময়ীর স্বামী মথুর মোহন বিশ্বাসের বিবাহ দেন। দক্ষিণেশ্বর সম্পর্কে রাসমণির পর মথুরবাবুই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকষণ করেন যথাসময়ে সে প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাইবে। রাজচন্দ্র সৎকার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পত্নীর অনুরোধে রাজচন্দ্র বর্ত্তমান ইডেন গার্ডেনের সন্নিকটবর্ত্তী "বাবুঘাট" নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার অপরাপর অসংখ্য সৎকীর্ত্তির মধ্যে বাবুরোড নির্ম্মাণ, বেলিয়াঘাটা খাল খনন, নিমতলা শ্মশান ঘাট আহেরীটোলা ঘাট প্রদান, হিন্দু কলেজ ও দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য প্রভৃতি সদনুষ্ঠানই সমধিক

উল্লেখযোগ্য। লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ দর্শনে তৎকালীন রাজ সরকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্রকে রায় উপাধিতে ভূষিত করেন। আমাদের রাসমণি এতদিনে সত্যকার 'রাণী' হইলেন। কিন্তু রাজসম্মান লাভের তিন বৎসর পরে ৩৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে রায় রাজচন্দ্র দাস মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রাণী রাসমণি রমণীর চরম দুঃখ বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইলেন।

সদ্যবিধবা রাসমণি ৫৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে সমারোহের সহিত রাজচন্দ্রের শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিলেন; এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে দান করিয়াছিলেন। স্বামী পরিত্যক্ত প্রভূত সম্পত্তি রাণী রাসমণিই অতঃপর পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রাখর্য্যে সেই বিপুল ধনরাশির এক কপর্দ্দকও অপব্যয় হয় নাই; অধিকন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। জমিদারীর সমস্ত কাগজপত্র রাণী স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া স্বাক্ষর করিতেন। তাঁহার বিধিদত্ত ভগবদ্ভক্তির পরিচয় এই ঘোর বিষয় কর্ম্মের দিনেও অপ্রকাশ ছিল না। তাঁহার জমিদারীর

কাগজপত্রে অঙ্কিত শীলমোহরে খোদাই করিয়া লিখিত ছিল—"কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" তবে বৈষ্ণব সন্তান রাসমণিকে এই সময় হইতে শক্তিপদের শরণ লইতে দেখা যায়। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি গলায় একগাছি মোটা তুলসীর মালা ধারণ করিতেন। রাণী পতি বিয়োগের পর হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিধবার মত আহার বিহারে যথানিয়মে সংযমী হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর সূর্য্য নারায়ণকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে রাণী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহদেবতা ৺রঘুনাথজীউকে প্রণিপাত করিতেন এবং ব্রাহ্মণকে একটী মুদ্রা প্রণামী দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত দুর্গানাম লিখিতেন। তদনন্তর ২।৩ ঘণ্টা জামাতাদিগের সাহায্যে জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অতঃপর স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া দীনদরিদ্রকে দ্বাদশটী মুদ্রা প্রদানান্তর তিনি অপরাহ্নে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন।

রাজচন্দ্রের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী রাসমণি অসংখ্য লোকহিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ

উল্লেখযোগ্য কয়েকটীর কথা আমরা এখানে অবতারণা করিতেছি :—সোনাই, বেলিয়াঘাটার খাল খনন; ভবানীপুর বাজার প্রতিষ্ঠা; কালীঘাটে গঙ্গায় ঘাট প্রদান ও গঙ্গাযাত্রীনিবাস নির্ম্মাণ; হালিসহরের জাহ্নবীতীরে ঘাট দান এবং সুবর্ণরেখার তীর হইতে পুরুষোত্তম জগন্নাথে যাইবার পথে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থ ভ্রমণে যাইয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন। তিনি ৺পুরীধামে তিনখানি হীরকখচিত সুবর্ণ মুকুট বিগ্রহের মস্তকে পরাইয়া দেন। আপন জমিদারীর প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ও লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে প্রজা সাধারণের সুবিধার জন্য মধুমতী ও নবগঙ্গার সংযোগ বিধান রাণীর এই দুইটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। জমিদার বা ভূস্বামী যদি নিজের ও গৃহ পরিজনের ভোগবিলাসে পর্য্যবসিত আপনার স্বার্থকে সংকীর্ণতম না করিয়া ফেলিয়া এইরূপ প্রজার হিতান্বেষণ ও তাহাদের হিতার্থে অকাতরে ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না, তাহা হইলে বাংলায়, এমন কি ভারতবর্ষে, জমিদার-প্রজা সম্বন্ধ চিরদিন পিতাপুত্রের অপার্থিব সম্বন্ধের

ন্যায় নিষ্কলুষ থাকিয়া সর্ব্ব প্রকার আলোচনার ও সংস্কার চেষ্টার বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিত, সন্দেহ নাই।

রাসমণির নারীহৃদয় উক্ত রূপ একদিকে যেমন কুসুম কোমল ছিল, তেমনি কর্ত্তব্যপালনে বজ্রাদপি কঠোর ছিল। তিনি মাতৃজাতীয়া; সুতরাং সন্তান স্থানীয় স্নেহের পাত্রের জন্য ত্যাগও যেমন তাঁহার স্বাভাবিক, তাহাকে রক্ষা করিবার বা তাহার দুঃখের প্রতিশোধ লইবার কালেও তেমনি তাঁহার করালিনী মূর্ত্তি অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার সংহারিণী মূর্ত্তিরও একটু পরিচয় আমরা এখানে দিবার চেষ্টা করিব।

(১) সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোন পথিকের উপর অন্যায় অত্যাচারকালে রাসমণির জামাতৃগণের বাধা পাইয়া গোরা সৈন্যগণ রাণীর জানবাজারস্থ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা লুট করে এবং গৃহপালিত যাবতীয় পশুপক্ষীর অঙ্গ ও পক্ষচ্ছেদ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। দ্বারবানেরা যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিয়া ক্ষতবিক্ষত দেহে পরাস্ত হইয়া নিরস্ত হয়। কিন্তু রাণী এই অবস্থায় শাণিত কৃপাণ হস্তে ৺রঘুনাথজীউর মন্দিরে ভৈরবী মূর্ত্তিতে বসিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাণীর জামাতা উক্ত গোরা সৈন্যগণের

অধ্যক্ষকে (Comanding officer) আনাইয়া সব নিষ্পত্তি করেন। পরে সরকার হইতে ইহার ক্ষতিপূরণ করার আদেশ হইয়াছিল কিন্তু রাণী তাহা গ্রহণ না করায় সরকার হইতে তাঁহার গৃহে গোরা পাহারা দিবার আদেশ হয়। আর সম্প্রতি এইরূপ আত্ম-নির্ভরতা ও নিষ্ঠা প্রসূত সৎ সাহসের অভাবে হিন্দু-মুসলমানের অসংখ্য দেবায়তন চূর্ণীকৃত, লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

(২) এক সময়ে তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত মকিমপুর পরগণায় নীল ব্যবসায়ী ডোন্যাল্ড সাহেব রাণীর নিরীহ প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেছেন, সংবাদ পাইয়া তিনি সদর হইতে—কয়েকজন বলিষ্ঠ দ্বারবান প্রেরণ করিয়া ডোন্যাল্ডকে এমন উত্তম মধ্যম প্রহার দেওয়াইয়া ছিলেন যে সুসভ্য ইংরাজ পুত্রকে কিছুকাল ধরিয়া শয্যাগত থাকিয়া লুণ্ঠিত পরধনের বহুলাংশ ব্যয় করিয়া উত্থানশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। তৎপরে সেই ক্ষাত্রবীর্য্যাভিমানী বৈশ্য কুলতিলক বীর পুঙ্গব নিজ দেহে নিদারুণ প্রহার চিহ্ন বর্ত্তমান দেখিয়া দুর্ব্বিসহ অপমানের জ্বালায় ক্রোধান্ধ হইয়া বিচারালয়ের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ইংরাজের

বিচরালয়ে অবিচারাভাব থাকাতে স্বাধীনচিত্ত ডোন্যাল্ড মহোদয় দরিদ্র কৃষকগণের রক্ত শোষণরূপ স্বাধিকার বিসর্জ্জন দিয়া নির্ভীকহৃদয়ে মকিমপুর অভিমুখে অগ্রসর হওয়া চিরকালের জন্য স্থগিত রাখিলেন। এইরূপ নির্ভীক সক্রিয় প্রজা হিতৈষণার যদি একান্ত অভাব না হইত, তবে কি আজ স্বদেশীয়গণের নীচতাপ্রসূত সহায়তায় এবং পৈশাচিক পরোক্ষ কর্ত্তৃত্বে ভারতের বস্ত্র শিল্পাদি অমূল্য বিভবরাশি এমন করিয়া নিঃশেষে লুপ্ত হইত?

বারান্তরে রাসমণি আপন প্রজার মঙ্গল কামনায় প্রবল প্রতাপ ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। মাতা সন্তানের বিপদাশঙ্কায় কোথা হইতে অনন্ত শক্তির অধিকারিণী হইয়া উঠেন এবং সন্তানকে বিপন্মুক্ত করিয়া মাতৃমহিমায় অধিকতর মহিমান্বিতা হন। রাণীও তেমনি যখন তাঁহার সন্তান তুল্য ধীবর প্রজাকুলকে ব্রিটিশসরকার কর্ত্তৃক নব স্থাপিত করভারে নিপীড়িত দেখিলেন তখন তাঁহার মাতৃহৃদয়ের রুদ্রমূর্ত্তি আত্ম প্রকাশ করিল। তিনি মহামান্য ভারতসম্রাটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে বিচার প্রার্থিনী হইলেন। সেখানকার বিচার ফল

তাঁহার মনোমত না হওয়ায়, অর্থাৎ ধর্ম্মাধিকারের বিচারে তিনি পরাস্ত হইলে, তাঁহার প্রজাবৎসল হৃদয় ক্ষান্ত হইতে পারিল না ; তিনি আপন বুদ্ধি কৌশলের আশ্রয় লইলেন। সেই সময়ে কলিকাতার পার্শ্বস্থ গঙ্গার যে অংশ তাঁহার ইজারাসূত্রে অধিকৃত ছিল, তিনি সেই অংশের গঙ্গায় পূর্ব্ব পশ্চিমে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত লৌহশৃঙ্খলাদির দুর্ভেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন। তখন গঙ্গার উপর দিয়া জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি পণ্য ও যাত্রীবাহী যানাদির গমনাগমন বন্ধ হওয়াতে ভারত সরকারকে রাসমণির অপূর্ব্ব কুটনীতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল এবং ধীবর প্রজাগণের নূতন কর সম্বন্ধীয় সর্ত্ত স্বীকারে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে হইল। প্রজাবাৎসল্য জয়যুক্ত হইল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, মাতৃ পিতৃ হৃদয়ের সহজ স্নেহ-সম্ভূত এইরূপ স্বাভাবিক প্রজানুরক্তি আজকাল সরকারকৃপাভিক্ষুক ভূস্বামী সম্প্রদায়কে বহু সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক যুক্তি সাহায্যেও হৃদয়ঙ্গম করাইতে দেশসেবকগণ বহু আয়াসেও বিফল মনোরথ!

এতদ্ব্যতীত রাণী রাসমণির বহু সৎকীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎসমুদয় এ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক

হইবে বিবেচনায় সেগুলির উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি কিংবা স্থানাপহরণ করিতে সাহস হইল না।

এ যাবৎ অনুল্লিখিত হইলেও দেবালয় প্রতিষ্ঠা এবং দেবসেবার ব্যবস্থা রাসমণির প্রধান সৎকীর্ত্তি সমূহের অন্যতম। তিনি দেবালয় নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড ভূমি কাশীধামে ক্রয় করিয়াছিলেন; তাঁহার দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস পরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভূমিখণ্ডে 'ত্রৈলোক্যেশ্বর' শিব প্রতিষ্ঠা করেন। গৃহ-দেবতা ৺রঘুনাথ জীউর প্রতি রাসমণির ঐকান্তিক ভক্তির কথা আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। বলা বাহুল্য তাঁহার সেবার বেশ সুবন্দোবস্তই ছিল। দক্ষিণেশ্বরের দেব সেবার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাণী ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের জমিদারী ভুক্ত দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা ২২৬০০০৲ মুদ্রায় যাহা অগ্রে ক্রীত ছিল, তাহা দানপত্র করিয়া দেন। উক্ত পরগণার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ কাছারীতে পূর্ব্ব হইতে "পটেশ্বরী" দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। সেখানকার দেব সেবার ব্যবস্থা রাণীর অধিকারে আসিয়া অক্ষুণ্ণ ত ছিলই

—বরং উন্নত হওয়াই স্বাভাবিক। অধুনা ব্রাহ্মণেতর ধনশালী দাতাগণের লোক বা দেশহিতকর কার্যোর গায়ে প্রায়ই নিজ নিজ জাতি বা বর্ণগত একটি ছাপ দৃষ্ট হয়; যেমন সুবর্ণবণিক সুবর্ণবণিকগণের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় দিয়া থাকেন, মাহিষ্য মাহিষ্যগণের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন, বার্তুক্ষত্রিয় বার্তুক্ষত্রিয়গণের জন্য অবৈতনিক ছাত্রাবাস বা পান্থশালা করিয়া দেন। কিন্তু এই গণ্ডীবন্ধন যে সংকীর্ণ মনের অগ্রদূত তাহা রাসমণিতে তাঁহার কোন অনুষ্ঠানেই পরিলক্ষিত হয় না। হইতে পারে, আজকালকার ব্যক্তিত্ব প্রসারিণী সভ্যতা রাণী রাসমণির অন্তর্দেবতাকে তখন তেমন করিয়া মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাহা কালের গুণ; তথাপি কালের প্রভাবের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও রাণীর এই বিশিষ্ট গৌরবটীকে ক্ষুণ্ণ করিতে মন চায় না।

তারপর দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণির অক্ষয় কীর্ত্তি। এইখানেই তাঁহার সৃষ্টির বৈচিত্র, অন্তরের ঔদার্য্য, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপস্যার মাহাত্ম্য ঈশ্বরানুগ্রহে মূর্ত্ত হইয়াছে। এই অতুলন কীর্ত্তি তাঁহার জীবনকে সার্থক করিয়াছে; জীবনের সকল ত্রুটি, সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব, যাবতীয়

অপূর্ণতা এখানে আসিয়া হারাইয়া গিয়াছে। ইহা যে মহৎ, ইহা যে বৃহৎ; ইহা যে পরিপূর্ণ। বসুধারার ঘৃতধারার মত অজস্রধারে অবিরাম সৌভাগ্যধারা রাসমণির মস্তকে বর্ষিত হউক। দক্ষিণেশ্বরের অবিনাশী কীর্ত্তি রাসমণিকে অমর করুক। দক্ষিণেশ্বরেই রাসমণি ধন্যা হউন।

ধ্যান।

স্বপ্নযোগে আদেশ প্রাপ্তা রাণী রাসমণি প্রভূত অনুসন্ধান ও নির্ব্বাচনের ফলে মনোনীত দক্ষিণেশ্বরের কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শশ্মান সম্বলিত ভূমি বহু আয়াসে অর্থের বিনিময়ে হস্তগত করিয়া তদীয় জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের উপর তথায় দেবালয় নির্ম্মাণের সমস্ত ভার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করিলেন। জটিল ব্যাপারের পরামর্শদাতারূপে রাণী আপনাকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত রাখিলেন; যদিও সে মুক্তি প্রকৃষ্ট কর্ম্মবন্ধনেরই নামান্তর মাত্র।

বিষয় কর্ম্মে সুদক্ষ গম্ভীর প্রকৃতি মথুরমোহন সাগ্রহে কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া অদম্য উৎসাহে

আপনাকে কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে পোস্তা গাঁথাইয়া গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে স্থানটীকে সুরক্ষিত করিলেন। শুনা যায়, এই পোস্তা বাঁধাইতে অন্যূন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল; ফলে পোস্তা এবং গঙ্গার ঘাট যেমনি সুদৃঢ় তেমনি সুদৃশ্য হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সুবৃহৎ 'নবরত্ন মন্দির' বিষ্ণুঘর, দ্বাদশটী সারিবদ্ধ মন্দির, অন্যান্য ঘর ও দুইটী নহবৎখানা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কুঠীবাড়ীও সংস্কার এবং পরিবর্দ্ধন হইল। আম্র, পনস প্রভৃতি নানাবিধ সুরস ফলের বৃক্ষ ঠাকুর বাড়ীর উদ্যান অংশে রোপিত হইতে লাগিল। পরে পূজার জন্য ভাগিরথী তীরে ও আশেপাশে করবী, জবা, গোলাপ, বেল, মল্লিকা, যূথিকা প্রভৃতি নানা জাতীয় সুগন্ধি ও মনোহর পুষ্পবৃক্ষের রমণীয় উদ্যান প্রস্তুত হইতে লাগিল।

রাণী এই মন্দির আরম্ভের দিন হইতে যথারীতি ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, ভূশয্যায় শয়ন ও পূজা জপ প্রভৃতি নিত্য করিতে লাগিলেন। মন্দিরাদি ও মূর্ত্তি কয়েকটীর নির্ম্মাণ কার্য্য, সমাধা হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন দশ বৎসরকাল লাগিয়াছিল।

এরূপ সুবৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ প্রচুর অর্থব্যয়

এবং দেবসেবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট সম্পত্তি প্রদান করিয়াও রাণীর তৃপ্তি হইল না। ঐ সকল দেবদেবীকে অন্নভোগ দিবার তাঁহার প্রবল অভিলাষ জন্মিল। আত্মবৎ সেবাই প্রকৃত সেবা। তাহার কোথাও ব্যতিক্রম হইলে, অতৃপ্ত হওয়া সেবক সেবিকার স্বাভাবিক। কিন্তু অন্নভোগ দিবার রাসমণির যথেষ্ট বাধা ছিল। অন্নভোগ দিবার পথে তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথাই একমাত্র অন্তরায়, অবগত হইয়া রাণী তাঁহার অন্তরের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় নানা স্থান হইতে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা আনাইতে লাগিলেন; কিন্তু প্রথম প্রথম কেহই তাঁহাকে উৎসাহিত করিল না। অবশেষে দৈবক্রমে কলিকাতা ঝামাপুকুরের চতুষ্পাটী হইতে বক্ষ্যমান ব্যবস্থা আসিল।—"প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাণী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শাস্ত্র-নিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।" এই অপ্রত্যাশিত অনুকূল ব্যবস্থা লাভ করিয়া রাণীর হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তাঁহার অপূর্ণ কামনা অচিরে অভিষ্ট লাভের দ্বিগুণিত আশায় নৃত্য করিয়া উঠিল। নিরহঙ্কারা ভক্তিমতী রাণী নিজ গুরুদেবের নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্ম-চারীর পদ গ্রহণ করিয়া থাকিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

এদিকে দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে যথারীতি প্রতিষ্ঠার শাস্ত্রসম্মত শুভদিনের প্রতীক্ষায় মূর্ত্তিটীকে কোন নিরাপদ স্থানে বাক্সের মধ্যে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এমন সময়ে একদিন কোন অলৌকিক কারণে মূর্ত্তিটী সিক্ত হইয়া (ঘামিয়া) উঠে এবং সেই উপলক্ষে রাণী প্রত্যাদিষ্ট হইলেন যে, "আমাকে আর কতদিন এরূপে আবদ্ধ রাখিবি? আমার বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।" এই ঘটনার পর রাণী আর ধৈর্য্য ধরিয়া শুভদিনের অপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি ব্যস্ত হইয়া আগামী স্নানযাত্রার পূর্ণিমার পূর্ব্বে কোন প্রশস্ত দিন না পাওয়ায়, সেইদিনই শুভকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে) বৃহস্পতিবার ৺জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন পূর্ণিমা তিথিতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে রাণী শ্রীশ্রী৺ভবতারিণীকে

প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেদিন "দীয়তাং ভূজ্যতাং" শব্দে দক্ষিণেশ্বর দিবারাত্র সমভাবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সেদিন অতিথি অভ্যাগতগণের পরিতুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন। সুদূর কান্যকুব্জ, বারানসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে অধ্যাপক পণ্ডিতগণ যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় এবং এক একটী স্বর্ণমুদ্রা বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যয়ভূষণে সমারোহ যাহা হইবার হইল। রাণী কিন্তু অর্থ অপেক্ষা ঐকান্তিকতার ডালি প্রাণ ভরিয়া অর্পণ করিয়া তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই দেবালয় নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী ৯০০০০০৲ নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। রাণী তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত দেবালয় মাত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেদিন কে জানিত যে অচিরে সেই ক্ষুদ্র দেবালয়েই একদিন মহামানবের গায়ত্রীর অনাহত ধ্বনি মূর্ত্ত হইবে।

দেবায়তনে দেবদেবীর সেবাকার্য্যে এক নূতন সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। দেবদেবীর নিত্য পূজা ও সেবার জন্য স্থায়ী পূজারী কোথায় পাওয়া যায়? যজন-

শ্রীশ্রী৺ভবতারিণী মাতা।

যাজনক্ষম কোন সদব্রাহ্মণই কৈবর্ত্তজাতীয়া রাণী রাসমণির দেবালয়ে পূজারী নিযুক্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন কামারপুকুর গ্রামবাসী রাণীর জনৈক কর্ম্মচারী উচ্চ পারিতোষিক লাভের আশায় তাহাদের গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রাণপনে বুঝাইয়া অবশেষে আপন অগ্রজকে শ্রীশ্রী৺রাধা কান্তের পূজারী করিয়া আনিলেন। তাহাতেও ৺কালীমাতার পূজারী মিলিল না দেখিয়া রাণী স্বয়ং ঝামাপুকুর চতুষ্পাটির শ্রীযুক্ত রামকুমার (চট্টোপাধ্যায়) ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া পূজা করিতে স্বীকৃত করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই যে দক্ষিণেশ্বরে পূজকরূপে প্রবেশ করিলেন, রাণী ও মথুরবাবু প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষ আর তাঁহাকে ছাড়িলেন না; নানা অনুরোধ উপরোধ ও জিদ করিয়া তাঁহাকে স্থায়ী পূজক হইতে সম্মত করিয়া দক্ষিণেশ্বরেই রাখিয়া দিলেন। এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও নিবাস কামারপুকুর; পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রা দেবী।

রামকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা গদাধর এই সময়ে দাদার নিকট কলিকাতায় ছিলেন এবং কিছু দিন হইতে সেখানকার কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে

নারায়ণ পূজা করিতেন। ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিন গদাধর জ্যেষ্ঠের সহিত প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। এই আগমন যে কত বড় আগমন, এই কিশোর ব্রাহ্মণকুমারের সেই স্মরণীয় দিবসে নিতান্ত অলক্ষিত উপস্থিতি যে কত বড় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা, তাহা সেদিন কেহ স্বপ্নেও জানিত না। গদাধর সেদিন দক্ষিণেশ্বরের প্রাণময় আনন্দোৎসবে যোগদান করিলেন বটে; কিন্তু কেন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে সম্ভবতঃ তাঁহার বংশ পরম্পরাপ্রাপ্ত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার তাঁহার মনে আহার সম্বন্ধে দ্বিধা আনিয়া দেওয়ায়, তিনি সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, সন্ধ্যাগমে মুদীর দোকান হইতে মুড়িমুড়কি ক্রয় করিয়া সামান্য জলযোগ করিলেন এবং পরে ঝামাপুকুর চতুষ্পাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গদাধরের পিতা ঋষিতুল্য ক্ষুদিরামের নৈষ্ঠিক ঈশ্বর-পরায়ণতা এবং মাতা চন্দ্রাদেবীর ঐকান্তিক ভাবুকতার সহিত হয়ত আরও অধিক কিছু লইয়া (১২৪১ সালে) ১৭৫৬ শকাব্দের ১০ই ফাল্গুন (ইংরাজি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী) শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলি

জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের সন্নিকটবর্ত্তী কামার পুকুর গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। বালক গদাধর সাময়িক বিদ্যাকে কেবলমাত্র অর্থকরীবোধে পরিত্যাগ করিয়া আপন পরমার্থলাভাকাঙ্ক্ষার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। সেই কোমলাঙ্গ সুগঠন বালকটীর বৃদ্ধজনপ্রশংসিত কোন কার্য্যেই যত্ন ছিল না। যত্ন ছিল যাত্রা শুনিতে, শুনিয়া তদ্রূপ নকল করিতে। আরও অধিক যত্ন ছিল দুর্গা, কালী প্রভৃতি ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতে এবং সময় বিশেষে শিব কৃষ্ণ সাজিয়া গৃহস্থদের অন্দরে প্রবেশিয়া স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে এবং জাতিভেদ না মানিয়া তাহা গ্রহণ করিতে। এই তথাকথিত 'দুষ্ট' ছেলেটী বড়দের নিকট "ভালছেলে" হইবার কোন চেষ্টা না করিয়া পাঠশালা ত্যাগ করিয়া যাত্রা, পাঁচালী, কবি শুনিয়া শুনিয়া সমুদয় কৃষ্ণ ও রামলীলা মুখস্থ করিয়াছিল এবং খেলার সাথীদের সহিত কখন কখন মাঠে গিয়া সেই সকল অভিনয়ের নকল করিত। নিজে কৃষ্ণ বা রাম সাজিত এবং অপর সকলকে অন্য সাঙ্গোপাঙ্গ সাজাইত ; আর কৃষকগণ দূর হইতে সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আপনাদের ক্ষেত্রকর্ম্ম ভুলিয়া যাইত।

এক কথায় বালক গদাধর আপনার বদ্ধমূল সংস্কারের প্রেরণায় "ভালছেলের" সুখ্যাতির লোভ সম্পূর্ণরূপে সম্বরণ করিয়া কাহারও বিচার বিবেচনায় ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া স্বাধীনভাবে স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়া উন্নত জীবনের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল।

এই অদ্ভুত বালক গদাধর ৫।৬ বৎসর বয়সের সময়েই ইদের দিন ইদ দেখিয়া ফিরিবার পথে কামার পুকুরের নিকটে একটী অশ্বত্থতলায় রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিয়া জীবনে প্রথম অলৌকিক দর্শনলাভ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ২।৩ ঘণ্টা পরে গদাধরের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। কিন্তু সেই ঘটনা হইতেই গদাধরের ঠাকুরদেবতা দেখিলেই সেই কথা মনে পড়িত এবং অমনি শরীর কণ্টকিত হইত, দুচক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। পুত্রের এইরূপ ভাববিকৃতি লক্ষ্য করিয়াও পুত্রগতপ্রাণা সরলা জননী কিংবা একান্ত ঈশ্বরানুরক্ত পিতা কেহই গদাধরের জন্মকালীন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (স্বপ্নাদি) স্মরণে পুত্রের উপর আপনাদের অপার্থিব চরিত্রের দৃষ্টান্ত ব্যতীত কোন অস্বাভাবিক শাসন বা চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিয়া এই "ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ" দেবতরুটীকে অবাধে বর্দ্ধিত হইতে দিয়াছিলেন। বাল্য

জীবনেই আরও কয়েকবার গদাধরকে অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রভাবে আবিষ্ট হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইতে এবং অপরকে মুগ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। এই বাল্যকালেই গদাধর উচ্চপদ, ধন, মান, বিদ্যা, প্রতিপত্তি প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষাকে নিকৃষ্ট বোধে মনে স্থান না দিয়া জগজ্জননীর "পূজারী বামুন" হইতে মনেমনে সংকল্প করিল।

এই নূতন ধরণের ছেলেটীর সমগ্র জীবনটী আলোচনা করিয়া দেখিতে কাহার না কৌতূহল হয়? সে আলোচনার উপাদানও দুষ্প্রাপ্য নহে—তবে বাধা, আমাদের নির্দ্দিষ্ট দেশ কাল পাত্র এই পুঁথির সমগ্র পৃষ্ঠাকয়খানিও সে কার্য্যে যথেষ্ট নহে, বর্ত্তমান সময়ও অনধিকারী আমাদের অনুকূল নহে। অতএব আমাদের সে কার্য্য সংক্ষেপে সারিতে হইবে; কাজেই আপনাদের শক্তি সামর্থ্য ও তাহার প্রয়োগকুশলতার উপর নির্ভর না করিয়া পূর্ব্বগামী মহাজনকে আশ্রয় করা এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অযৌক্তিক না হইয়া বরং সমধিক সমীচীন। ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে কাহারই বিচার সহ নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত আমাদের উপেক্ষনীয় নহে; অধিকন্তু সে সিদ্ধান্তে যদি ব্যক্তি গৌরবও যুক্ত হয়

তবে ত কথাই নাই; আমরা ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বস্তুই লাভ করিয়াছি এবং তাহা নিম্নে আমাদের পূর্ণ অনুমোদন সহ প্রদত্ত হইল—

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্তরঙ্গগণের অন্যতম স্বামী সারদানন্দ গদাধরের বাল্য ও কৈশোর জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, "তবে একথা বলিতে হয় যে ঠাকুরের * বাল্যজীবন সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার অনন্যসাধারণ উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্য শক্তি প্রকাশের পরিচায়ক তাহা নহে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি ঐরূপ হইলেও অপর সকলগুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদের কতকগুলি অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচার বুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার এবং কতকগুলি

* ভক্তগণদত্ত রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের "ঠাকুর" অভিধান বঙ্গ পাঠক সমাজে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে তথাপি আমরা ঐতিহাসিক নিষ্ঠার দোহাই দিয়া পাদটীকা দিতেছি।

অপার প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। আর ঐসকল শ্রেণীর সকল ঘটনাবলীর ভিতরেই তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায় বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতাই যেন তাঁহার মনের স্বাভাবিক ধাতু, অথবা ঐ উপাদানেই যেন তাঁহার মন নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত মনের ঐ উপাদানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থা বিশেষে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস, রঙ্গরস, প্রেম ও করুণার তরঙ্গ সমূহের সময় সময় উদয় করিতেছে।

* * * *

"ঠাকুরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে, এ মন যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পক্ষে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে সরলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে এ হৃদয়, ঈশ্বরের উপর, আপনার উপর এবং মানব সাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস

স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্য্যে অগ্রসর হইবে; নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ ত দূরের কথা, সঙ্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র গন্ধও যে সকল ভাবে অনুভূত হইবে কখনই তাহাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না; এবং পবিত্র প্রেম ও করুণাই কেবল উহাকে সর্ব্বকালে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মিত করিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, এ হৃদয় ও মনকে আপনার বা অন্যের অন্তরের বা বাহিরের কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের হৃদয় মনের এইরূপ গঠনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধক জীবনের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

"সাধকভাবের প্রথমবিকাশ ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখিতে পাই কলিকাতায়, তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন 'ও চালকলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না। আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাই যাহাতে বাস্তবিক জ্ঞানের উদয় হইয়া

মানুষ কৃতকৃতার্থ হয়।' ঠাকুরের বয়স তখন চৌদ্দ বা পনর বৎসর হইবে।

এখন আর পাঠকগণকে নূতন করিয়া নিশ্চয় বলিয়া দিতে হইবে না যে গদাধর, শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঠাকুর একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র।

গদাধরের মনোভাব অবগত হইয়া এই সময়ে রামকুমার কনিষ্ঠকে নিজের করণীয় কয়েকটী গৃহস্থবাটীর নিত্যপূজার ভারার্পণ করিয়া আপনি চতুষ্পাঠীতে কার্য্যে ব্রতী রহিলেন। গদাধর আপন মনোমত পূজা কার্য্য লইয়া ঝামাপুকুরে সানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিল। গদাধরের বয়স এই সময়ে চৌদ্দ কিংবা পনর হইবে। গদাধর অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হয় এবং তদবধি এই পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ অগ্রজের স্নেহাচ্ছায়ায় ও বৃদ্ধা জননীর সাদর অনুমোদনে গদাধর এইরূপেই জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সত্যকার স্নেহনির্ঝরে কখনও বন্ধনের শৈবালরাশি জন্মিতে পায় না বলিয়া এই "স্বতন্ত্র উদাসীন" বালকটীর জীবনতরীখানি স্বচ্ছন্দে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিন বৎসর এই ভাবেই কাটিল।

এমন সময় পূর্ব্ববর্ণিত * ঘটনা পরম্পরায় ক্রমে রামকুমার ও বিশেষ করিয়া গদাধরের জীবনের নূতন অধ্যায় উৎঘাটনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বনামধন্যা ভক্তিমতী রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে সুবৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়া রামকুমারকে পূজায় ব্রতী করিয়া লইয়া গেলেন। গদাধরও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিল এবং প্রতিষ্ঠার দিন অপরাহ্নে কিরূপে যে ঝামাপুকুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পরদিন প্রত্যূষেই গদাধর অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্যই হউক বা অতঃপর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য বাকী ছিল তাহা দেখিতে কৌতূহলপরবশ হইয়াই হউক, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়াই বুঝিতে পারিল যে রাণী ও মথুরবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন সেখানে প্রসাদ পাইবার জন্য অগ্রজের অনুরোধ না শুনিয়া গদাধর ভোজনকালে ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসিল। ইহার পর গদাধর কার্য্যসমাপনান্তে

---

* এই "ধ্যান" অধ্যায়েরই প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা ৪৭ হইতে ৪৮।

অগ্রজ যথাসময়ে আসিবেন ভাবিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় সাতদিন ঝামাপুকুরেই রহিল। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার আসিলেন না, তখন অগ্রজের সংবাদ লইতে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন এবং শুনিলেন যে রাণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি চির-কালের জন্য তথায় শ্রীশ্রী৺ভবতারিণীর পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন।

এ সংবাদ কিন্তু গদাধরের প্রীতিপ্রদ হইল না; কেন না রামকুমারের এইস্থানে পূজকপদ গ্রহণ তাহার মনঃপুত হইল না, গদাধর পিতার অশূদ্রযাজিত্বের ও অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অগ্রজকে নিবৃত্ত করিতে চাহিল রামকুমারও শাস্ত্র ও যুক্তিসহায়ে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু শেষে ধর্ম্ম-পত্ররূপ * দৈবাধীন সরল উপায় অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত গদাধর রামকুমারের কার্য্য অনুমোদন করিতে পারিল না।

ধর্ম্মপত্রের মীমাংসায় অগ্রজের দক্ষিণেশ্বরে পূজাকার্য্য গ্রহণ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও গদাধরের অন্য

* একপ্রকার লটারী প্রথা। 'লীলাপ্রসঙ্গে' ইহার বিশদ বর্ণনা আছে।

চিন্তা আসিয়া মনে হইল। চিন্তা এই যে, ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী ত উঠিয়া গেল; রামকুমারও অন্যত্র কর্ম্মগ্রহণ করিলেন; গদাধর তবে এখন কি করিবে? এইরূপ কিংকর্ত্তব্য অনিশ্চয়ভাবে গদাধর দেবালয় প্রতিষ্ঠা হইবার পর একমাসকাল দক্ষিণেশ্বরেই অবস্থান করিয়াছিল। ইতিমধ্যে মথুরবাবু তাহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার বেশকারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া রামকুমারকে বলেন। রামকুমার কিন্তু কনিষ্ঠের মানসিক অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া তখনকার মত উক্ত প্রস্তাব চাপা দিলেন। ভগবান ভিন্ন অপর আবার কাহার চাকুরী করিব? এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে গদাধরের মনে দৃঢ়বদ্ধ ত ছিলই তাহার উপর দেবদেবীর অলঙ্কারাদির গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে কোন চাকুরী গ্রহণ করিতে তাহার অন্তঃকরণ কিছুতেই চাহিতেছিল না।

এই সময়কার দক্ষিণেশ্বর বাসকালে রামকুমার নানাবিধ যুক্তিসহায়ে কনিষ্ঠকে ৺জগদম্বার অন্নভোগ প্রসাদ পাইতে বলিলেও গদাধর তাহাতে সম্মত হইতে পারে নাই। অবশেষে অগ্রজের অনুরোধে ও পরামর্শে গদাধর ঠাকুরবাটী হইতে সিধা লইয়া পূতসলিলা

জাহ্নবী তীরে স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতে লাগিল। গদাধরের আজীবন গঙ্গার প্রতি গভীর ভক্তি ছিল। মনোরম ভাগিরথী তীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটী, সুবিশাল দেবালয়, সাধকানুষ্ঠিত দেবসেবা, পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ ও দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণীর ও তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধাভক্তি ক্রমেই গদাধরের চিত্তে যে অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করিল তাহাতেই কোথা হইতে তাহার মনের যত কিছু দ্বিধা সঙ্কোচ অপসারিত হইয়া গেল।

এমন সময় গদাধরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তি গদাধরের ভাগিনেয় শ্রীহৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়। হৃদয় অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কাজ কর্ম্মের সন্ধানে আরও দুই একস্থানে ঘুরিয়া এখানে মাতুলদ্বয়ের অবস্থান সংবাদ পাইয়া নিজ সঙ্কল্প সিদ্ধির আশায় আসিয়াছিল। প্রায় সমবয়স্ক এই ভাগিনেয়কে সহচররূপে পাইয়া গদাধরেরও দক্ষিণেশ্বর বাস অধিক-তর আনন্দদায়ক ও সহজ হইয়াছিল। উভয়ে একত্রে স্নান, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশনাদি সকল কার্য্য করিতে লাগিল। অদূর ভবিষ্যতে গদাধরের সুদীর্ঘ সাধন

জীবনে এই বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ যুবকটী তাহার উদ্যম, সাহস, পরিশ্রমপটুতা এবং ভাবুকতার সংস্পর্শ বর্জ্জিত অনলস অবস্থানুযায়ী কর্ম্মবুদ্ধি লইয়া সহচররূপে না থাকিলে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শরীর রক্ষা হইত কি না বলা শক্ত। হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে গদাধর সপ্তদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টাদশে কয়েকমাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছে। আর হৃদয় তখন ষোড়শ বর্ষীয় যুবক মাত্র।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে মথুরবাবুর বিশেষ আগ্রহে এবং হৃদয় ৺মায়ের অলঙ্কারাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উৎসাহিত করায় গদাধর শ্রীশ্রী৺ভবতারিণীর বেশকারীর পদে নিযুক্ত হইল। দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে গদাধর এইরূপে রাসমণির ঠাকুর বাড়ীতে বিধাতার অব্যর্থ বিধানে বাঁধা পড়িল। এসময়েও গদাধর স্বপাকে আহার করিতেছে এবং নিজে পূজারীর পদে ব্রতী না হওয়া পর্য্যন্ত আহারের এই নিষ্ঠা গদাধর ত্যাগ করিতে পারে নাই।

তারপরে ১২৬২ সালের ভাদ্রমাসে নন্দোৎসবের দিন মধ্যাহ্নে ৺রাধা গোবিন্দ জীউর পূজা হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৺গোবিন্দ জীউকে

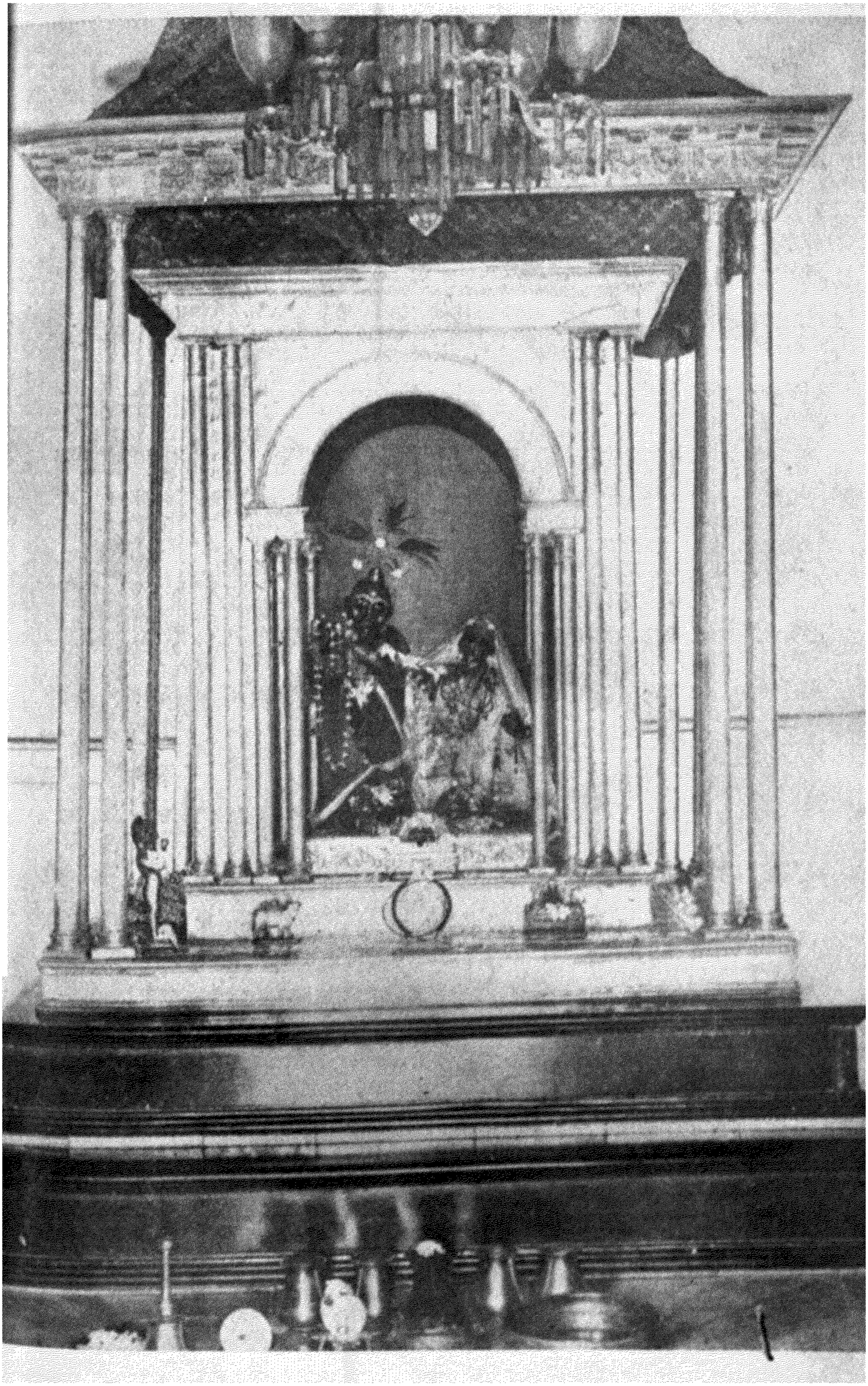

কক্ষান্তরে শয়ন করাইতে যাইবার কালে বিগ্রহ সহসা হস্তচ্যুত হওয়ায় বিগ্রহের একখানি শ্রীপদ ভঙ্গ হয়। এই হিন্দুসংস্কার বিরোধী বিষম ব্যাপারের মীমাংসার জন্য বহু পণ্ডিতের ব্যবস্থা ও তাহার বিচার আলোচনায় সেই দণ্ডেই ঠাকুরবাটী চঞ্চল ও মুখর হইয়া উঠিল। অবশেষে যুবক গদাধরের পরামর্শে বিগ্রহের ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল এবং সেই ভগ্ন বিগ্রহ জুড়িবার কার্য্য স্বয়ং গদাধরকেই করিতে হইল। ইতি পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে গদাধরের মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশ হইতে দেখিয়াই সম্ভবতঃ মথুরবাবু প্রভৃতি তাহার পরামর্শে অমন শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকিবেন। তদ্ভিন্ন গদাধর ভগ্নবিগ্রহ এমন নিপুণভাবে জুড়িয়াছিল যে অদ্যাপি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও উহার ভগ্নাংশ বাহির করা সুকঠিন। এদিকে সেই দিনই অনবধানতার অপরাধে ক্ষেত্রনাথ কর্ম্মচ্যুত হইলে শ্রীশ্রী৺রাধা গোবিন্দ জীউর পূজার ভার গদাধরের উপরেই ন্যস্ত হইল। এবং হৃদয় ৺কালীমাতার বেশকারী নিযুক্ত হইল।

জপা।

যেদিন গদাধর পূজকরূপে দক্ষিণেশ্বরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন সেইদিন হইতেই আজিকার সত্যকার দক্ষিণেশ্বরেব ভিত্তি প্রোথিত হইল। পূজা এবং পূজকের জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনায় আমাদেব দক্ষিণেশ্বর জন্ম পরিগ্রহ করিল। অতঃপর শিশু দক্ষিণেশ্বর কেমন করিয়া ধীরে ধীরে যৌবনের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও সামর্থ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল তাহাই আমরা পর পর ক্রম অনুসারে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল ধরিয়া দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্নমতের সাধনার যে হোমানল জ্বালিয়াছিলেন তাহারই ফলে আজ ভিন্ন ভিন্ন আলোকোজ্জ্বল পথগুলি আমাদিগের ন্যায় ভ্রান্ত পথিকগণকে বিশ্বের মনোময় কোষে অবস্থিত ভাব রাজ্যের এই অগ্নিশুদ্ধ দক্ষিণেশ্বররূপ মণিকোটার অব্যর্থ নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছে। তাঁহার দ্বাদশবর্ষ সাধন কাল আমরা এইরূপে বিভক্ত দেখিতে পাই ; প্রথমতঃ ১২৬২ হইতে ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল তাঁহার

স্বকৃত সাধন। এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়ামাতৃদর্শন লাভে কৃতার্থ সন্তান ১২৬৬ সাল হইতে ১২৬৯ সাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণী সাহায্যে যথাশাস্ত্র চৌযট্টিখানা তন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সাধন সমাপন করেন; এবং জটাধারী সাহায্যে রামাৎসাধন শেষ করিয়া বাৎসল্য, দাস্য, মধুরাদি ভাব সাধনে সিদ্ধ হয়েন। অতঃপর ১২৭০ সাল হইতে ১২৭৩ সাল পর্য্যন্ত তোতাপুরীর সাহায্যে তিনি বেদান্ত সাধন সমাধা করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। পরে একবৎসর কাল ধরিয়া ইসলাম খৃষ্ট প্রভৃতি সাধনের মধ্যদিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিয়া তুলেন। এই সন ১২৬১ হইতে ১২৭৪ সাল পর্য্যন্ত পূর্ণ দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া দক্ষিণেশ্বর যে শুদ্ধি যজ্ঞের মধ্য দিয়া সিদ্ধপীঠ হইয়াছে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইব। সর্ব্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ এই দক্ষিণেশ্বর পুণ্যতীর্থেই ১২৮০ সালে ষোড়শীপূজা করিয়া মানবহৃদয়ের অনির্ব্বান বন্ধনজ্বালাতে ত্যাগ নিদ্দিষ্ট মুক্তির শান্তিময় আনন্দ প্রলেপ দান করিয়াছিলেন।

গদাধর পূজক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূজার যেন প্রাণ সঞ্চার হইল। সেই জীবন্ত পূজা যেমন দর্শনীয়

তেমনি উপভোগ্য ছিল যেই দেখিত সেই তন্ময় হইয়া যাইত। পূজাকালে কেহ নিকটে আসিয়া কথা কহিলে পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না ; অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গ সকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজদেহে উজ্জ্বল বর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে ইহা তাঁহার প্রকৃতই বোধ হইত। পূজা-কালীন তাঁহার তেজঃপুঞ্জ শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দর্শনে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন—"সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন।" পূজ্য মূর্ত্তির নিকটে তাঁহার সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসময় মধুর কণ্ঠের বিশুদ্ধ গান এবং গান গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাওয়া যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

এই সময় হইতে গদাধরে নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং যাবতীয় সাংসারিক ব্যাপারে একটা উদাসীন ভাব সদাই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সকাল সন্ধ্যা গদাধর হয়ত একাকী গঙ্গাতীরে পদ চারণা করিতেছেন কখনও বা পঞ্চবটী মূলে স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার এমভাবস্থা দর্শনে জ্যেষ্ঠ রামকুমার প্রথমে মনে করিলেন যে আজন্ম জননীর নিকটে থাকিয়া এখন

দূরে আসায় তাঁহার অদর্শনে তাঁহারই অঞ্চলের নিধি সম্ভবতঃ এইরূপ উন্মনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু গদাধরের সেরূপ কোন মনোভাব কিছুকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহার গোচর হইল না তখন তিনি নিজের অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠ যাহাতে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাঁহাকে সেইরূপ প্রস্তুত করিতে প্রয়াসী হইলেন। তাঁহাকে রামকুমার চণ্ডীপাঠ এবং শ্রীশ্রীকালীমাতা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তান্ত্রিক দীক্ষা ব্যতিরেকে শক্তি পূজার অধিকারী হওয়া যায় না বলিয়া এইসময়ে গদাধরের অনুমোদনে রামকুমার কনিষ্ঠকে কলিকাতা বৈঠকখানাবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক প্রবীন শক্তি সাধকের নিকটে দীক্ষিত করিতে মনস্থ করিলেন। গদাধর যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর সমাধিস্থ হন; তাহাতে শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দর্শনে প্রসন্ন হইয়া ইষ্টলাভ বিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

অতঃপর রামকুমার নিজের শরীর অপটু হওয়ায় অল্পায়াস সাধ্য শ্রীশ্রী৺রাধা গোবিন্দজীর পূজা স্বয়ং

সম্পন্ন করিতে এবং শ্রীশ্রী৺কালীমাতার পূজা কার্যে গদাধরকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে রামকুমার মথুর বাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাকান্তের পূজায় এবং গদাধরকে ৺কালীমাতার পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়া বহির্গত হইলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরে শ্যামনগর মূলাযোড় নামক স্থানে কার্য্যান্তরে গমন করিয়া তিনি ঐ স্থানেই সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই শোচনীয় ঘটনা কালীবাটী প্রতিষ্ঠার বৎসর অর্থাৎ ১২৬২ সালের শেষ ভাগেই ঘটিল। এই পিতৃতুল্য অগ্রজের আকস্মিক মৃত্যুতে গদাধর অন্তরে যে ব্যথা পাইলেন তাহার নিদারুণ আঘাতেই গদাধরের প্রকৃত সাধন ফুটিয়া উঠিল। যে শোক সংসারাসক্ত জীবের মনে অবসাদ সৃষ্টি করিয়া তামসিক নিষ্ক্রিয়ভাব আনয়ন করে সেই শোকের বেদনাই গদাধরের মনে সংসারের অনিত্যতার উপরে যে নিত্য সত্য বস্তু বিরাজ করিতেছে তাহারই দর্শনলাভে উন্মত্ত ব্যাকুলতার অমৃত সিঞ্চন করিল।

এই সময় হইতে তিনি শ্রীশ্রী৺জগন্মাতার আরা-

ধনায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিলেন। গদাধর বিশ্বজননীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া পূজা, ধ্যান, প্রার্থনা ও গানে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখন হইতে দেখা যাইত বহুক্ষণ ধরিয়া পূজা করিয়া পূজা শেষে তিনি কমলাকান্ত, রামপ্রসাদাদি ভক্তগণ বিরচিত সঙ্গীতসকল গাহিতে গাহিতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন অথবা ৺মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে তন্মনস্কভাবে বসিয়া দিন যাপন করিতেছেন। এইসময় হইতে তিনি ৺জগন্মাতার স্মরণ মননাদি ভিন্ন বৃথা বাক্যালাপাদি করিয়া তিলমাত্র সময় ব্যয় করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেছেন, দেখিতে পাওয়া যাইত। আবার মধ্যাহ্নে বা রাত্রিতে যখন ৺দেবীর মন্দিরদ্বার রুদ্ধ, তখনও তিনি লোক সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চবটীর চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়া ৺জগদম্বার চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কাল যাপন করিতেন।

হৃদয় মাতুলের এইরূপ আহারে তাচ্ছিল্য, নিদ্রা-ত্যাগ, এবং রাত্রিদিন ধ্যানধারণা প্রভৃতি উন্মত্তের ন্যায় আচরণাদি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শরীর ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় চিন্তিত হইল। কিন্তু হৃদয় জানিত যে

বাল্যকাল হইতে গদাধর যখন যাহা ধরিয়াছেন তখনই তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারে নাই; অতএব এ ক্ষেত্রেও প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা।

পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ স্থান তখন নীচু জমি, খানা খন্দ ও নানাজাতীয় বৃক্ষলতায় জঙ্গলপূর্ণ ছিল। সেখানে একটি ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। উক্ত স্থান কবর ভাঙ্গা এবং তদুপরি জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় দিবারাত্র নির্জ্জন থাকিত। ঐ আমলকীবৃক্ষটি নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও তাহা নয়নগোচর হইত না। গদাধর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যান ধারণা করিতেন। হৃদয় মাতুলকে রাত্রে অনুসরণ করিয়াও প্রথম প্রথম স্থানটীর বিচিত্র অবস্থানের জন্য তাঁহার গন্তব্যস্থানটী নির্দ্ধারণ করিতে না পারায় একদিন গদাধরকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন, "ওখানে একটী আমলকী গাছ আছে, তার তলায় বসে ধ্যান করি; শাস্ত্রে বলে শুনেছি, আমলকী গাছের তলায় যে যা কামনা করে ধ্যানকরে তার তা সিদ্ধি হয়।" তাহার পর হৃদয় তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত

করিবার আশায় এবং নিজেও ভয়ে ওখানে যাইতে সাহসী না হইয়া রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে ঢিল ছুড়িত। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা যখন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যর্থতালাভ করিল তখন একদিন হৃদয় সাহস করিয়া গিয়া দেখে যে যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্র একটী নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া গদাধর আমলকী বৃক্ষতলে গভীর ধ্যানমগ্ন। অনেক ডাকাডাকির পর ধ্যানভঙ্গ করিয়া ঐরূপ বিষদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় গদাধর বলিলেন, "তুই কি জানিস ? এই রকমে সব পাশ মুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয় ; জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি আর অভিমান— এই অষ্টপাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে। পৈতাগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ সকলের চেয়ে বড়' এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ ; ৺মাকে ডাকতে হলে এই সব পাশ ফেলে দিয়ে একমনে ডাকতে হয়, তাই এইসব খুলে রেখেছি ; ধ্যানকরা শেষ হলে ফেরবার সময় আবার পরে যাব।" এই সময়ে গদাধর জাত্যাভিমান নাশ করিবার জন্য সকলের পরিত্যক্ত অশুদ্ধস্থান স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। 'সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান, দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদিগের ভোজন সাঙ্গ হইলে

তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন তিনি দেবতার প্রসাদজ্ঞানে ভক্ষণ ও মস্তকে ধারণ করিতেন। লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান পাকা করিবার জন্য তিনি কয়েকখণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র পৃথক পৃথক দুই হস্তে লইয়া "টাকা মাটী, মাটী টাকা" বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা ঘটনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গদাধরকে নিজ অন্তরবাহির, ভাবনাকর্ম্ম, স্থূলসূক্ষ্ম, মনমুখ এক সূত্রে গাঁথিয়া আপনার সাধন জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে দেখা যায়।

এদিকে গদাধরের পূজা দিন দিন অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করিতে লাগিল। হৃদয়ের গভীর ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ অপূর্ব্ব সঙ্গীত এবং সরল ও বিশ্বস্থ হৃদয়ের ঐকান্তিক ব্যাকুল প্রার্থনা এখন হইতে তাঁহার পূজার বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া উঠিল। এই অদ্ভুত পূজকের দেবীর পূজা ও সেবা সম্পাদন করিবার নির্দ্দিষ্ট কালও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কারণ, পূজা করিতে বসিয়া তিনি ব্যবস্থামত নিজমস্তকে একটী পুষ্প দিয়াই হয়ত দুইঘণ্টাকাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন অথবা অন্নাদি নিবেদন করিয়া মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতে হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন। মনের

এইরূপ একমুখী গতিতে তাঁহার স্বভাবে অনেক ভাবান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল ; আহার কমিয়া গেল, নিদ্রা গেল, শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তকে নিরন্তর প্রবাহিত হওয়ায় বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা আরক্তিম হইয়া থাকিত, চক্ষু অবিরল অশ্রুধারে কিংবা অশ্রুসম্ভাবনায় সর্ব্বদা রক্তাভ হইয়া থাকিত এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ও চিন্তায় দেহও সর্ব্বদা অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া থাকিত।

পরে তাঁহার নিজ মুখেই শুনা গিয়াছে যে এই অবস্থা যখন চরমে উঠিল সেই সময় একদিন তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে ৺জগজ্জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "মা, এত যে ডাকছি তার কিছুই তুই শুনছিস্ না ?" তিনি বলিতেন "দেখা পাইলাম না বলিয়া হৃদয়ে তখন অসহ্য যন্ত্রণা ; জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিংড়াইয়া থাকে, মনে হইল, ভিতরে হৃদয় মনটাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে। মার দেখা বোধহয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রনায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাঁহারই

উপর পড়িল উহার সাহায্যে এই দণ্ডেই ইহার অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা হস্তে লইয়াছি, এমন সময়ে সহসা ৺মার অদ্ভুত অপূর্ব্বদর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্‌দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিনা। অন্তরে অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব্ব জমাট বাঁধা আনন্দ ও ৺মার সাক্ষাৎপ্রকাশ রহিয়াছে এইটুকু মাত্রই হুঁস ছিল।"

এই সময় হইতে পূজার চিরপ্রচলিত ক্রম অনুসরণ করাও এই ইষ্টপদে আত্মসমর্পিত পূজকের আর সাধ্যায়ত্ত রহিল না। নানাপ্রকার অতীন্দ্রিয় অলৌকিক দর্শন এই সময়ে গদাধরের ঘটিতে লাগিল। হয়ত এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্র চারিদিক হইতে তাহার উজ্জ্বল উর্ম্মিমালা লইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, দেখিতে পাইতেন; কখনও বা চৈতন্যঘন, জ্যোতির্ঘণ জগদম্বার বরাভয়কর মূর্ত্তির পূর্ণ অথবা আংশিক প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। ঐ সকল দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগজ্জননীর চিন্ময়ী মূর্ত্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য তাঁহার প্রাণে

একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিত ; যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেন চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেন ; অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হইত, বিষয়জ্ঞান বিবর্জ্জিত হওয়ায় চারিপার্শ্বের লোকজনদের চিত্রপটে আঁকা মূর্ত্তির ন্যায় বোধ হইত এবং তাহাদের দেখিয়া মনে লেশমাত্র লজ্জা, ভয় বা সঙ্কোচের উদয় হইত না।

এই সময় হইতে গদাধর সর্ব্বদা বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় মায়ের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন ; মায়ের শ্রীপাদপদ্ম কখনও বা হাস্যদীপ্ত স্নিগ্ধ শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেন। মাকে অন্ন নিবেদন করিয়া স্পষ্টই দেখিতেন, মার নয়ন হইতে জ্যোতিঃ রশ্মি লক্ লক্ করিয়া নির্গত হইয়া আহার্য্য সমুদয় স্পর্শ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে, কখনও পূজাকালে জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিতে গিয়া তন্ময়ভাবে চিন্তা করিতে করিতে সহসা "রোস্ রোস্ আগে মন্ত্রটা বলি তারপর খাস্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও পূজা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন। তৎকালে মন্দিরাভ্যন্তরস্থিতা পাষাণময়ীকে চৈতন্যময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিতেন ; কখনও সেই মূর্ত্তির নাসিকায় হাত দিয়া দেখিতেন, সত্যসত্যই নিঃশ্বাস

পড়িতেছে। তন্ন তন্ন অনুসন্ধানেও মায়ের দিব্যঅঙ্গের ছায়া পড়িতে দেখেন নাই। কখনও নিজকক্ষে বসিয়া মাকে পাঁইজোর পরিয়া আনন্দিত মনে ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতে শুনিয়াছেন এবং পরক্ষণেই ত্রস্তে বাহিরে আসায় আলুলায়িতকেশা মাতাকে কলিকাতা অথবা গঙ্গার দিকে দর্শন করিতে দেখিয়াছেন। এইসময় হইতে গদাধরের দিব্যোন্মাদ ভাব হয়। কখনও মত্ত ব্যক্তির ন্যায় টলিতে টলিতে সিংহাসনের উপরে উঠিয়া জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর, গান, পরিহাস বা কথোপকথন অথবা শ্রীমূর্ত্তির হাত ধরিয়া হয়ত নৃত্যই করিতে থাকিতেন। কখনও ভোগের থালা হইতে অন্ন তুলিয়া লইয়া "খা, মা, বেশকরে খা। আমি খাব ? আচ্ছা খাচ্চি" বলিয়া নিজেই খাইতে লাগিলেন ; অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে তুলিয়া দিয়া বলিলেন "আমি ত খেয়েছি ; তুই খা।" কখনও রাত্রিতে ৺জগন্মাতার আরতি করিয়া "আমাকে কাছে শুতে বলছিস্ ? আচ্ছা শুচ্ছি" বলিয়া মায়ের রৌপ্যনির্ম্মিত খাটে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে গদাধরের এইসকল অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ কর্ম্মচারীপরম্পরায়

রাষ্ট্র হইলে রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর গোচর হয় ; তিনি গোপনে একদিন মন্দিরে যাইয়া স্বচক্ষে উক্ত ক্রিয়াকলাপ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মনে করিলেন, এতদিনে শ্রীশ্রী৺জগন্মাতার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল।

ওদিকে গদাধর জননী চন্দ্রাদেবী পুত্রের দিব্যোন্মাদ অবস্থার আচরণের বিকৃত বিবরণ অবগত হইয়া পুত্রের চিকিৎসার্থ নিজের নিকট কামারপুকুরে আনাইলেন। এই সময়ে সন ১২৬৫ সালে ভাবস্থ গদাধরের নির্দ্দেশ-মত কামারপুকুরের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী জয়রামবাটী গ্রামস্থ শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদামণি দেবীর সহিত গদাধরের বিবাহ হয়। গদাধর বেশ উৎসাহের সহিত বিবাহ করিয়া আসিলেন। এই সময় গদাধরের বয়স একবিংশতিবর্ষ এবং নববধূ পঞ্চমবর্ষীয়া। গদাধরকে ৩০০৲ টাকা পণ দিয়া কন্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বিবাহের পর গদাধর আবার দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গদাধরের দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেই ১২৬৫ সালে ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার খুল্লতাত পুত্র শ্রীরাম-তারক চট্টোপাধ্যায় (হলধারী) দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নৈষ্ঠিক

সাধক ছিলেন। তখন গদাধরের ভাবোন্মত্ততা ও রাত্রিদিন ব্যাকুল প্রার্থনা দর্শনে মথুর বাবু তাঁহাকে নিশ্চিন্তে প্রার্থনা করিবার অবকাশ দিয়া হলধারীকে ৺মায়ের পূজক নিযুক্ত করেন। হলধারী মাসাবধি কাল পূজা করেন; বলিদান তাঁহার মত বিরুদ্ধ থাকায় তিনি উহাতে সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইতেন। মাসাবধিকাল গত হইলে ৺দেবী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হলধারীকে আদেশ করেন "আমার পূজা তোকে করিতে হইবে না; করিলে সেবাপরাধে তোর সন্তানের মৃত্যু হইবে।" এই আদেশ প্রথমে মনের খেয়াল বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার কিছুকাল পরে হলধারী একদিন তাঁহার পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ৺মায়ের পূজায় বিরত হয়েন।

ঐ সময়ে গদাধরের আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; শরীরসংস্কারে তাঁহার আদৌ মন ছিল না; মস্তকের অবিন্যস্ত কেশ ধূলাবালি লাগিয়া আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল; একাগ্র মনে ধ্যানে বসিলে পক্ষীসকল দেহকে জড় পদার্থ জ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথায় বসিয়া তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত। তিনি

কখনও হয়ত ভগবদ্বিরহে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ভূমিতে মুখঘর্ষণ করিতেন এবং সেই আঘাতে রক্তপাত হইত। সারাদিন ধরিয়া কেবল মার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন। সন্ধ্যাগমে "একটী দিন বৃথা যাইল-মার দর্শন হইল না" বলিয়া চাৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেন।

এই সময় হইতেই নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। হনুমানের ন্যায় অনন্য ভক্তিতেই ভক্তবৎসলের দর্শন সম্ভবপর, বিবেচনায় তিনি নিজেতে হনুমানের ভাব আরোপ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি আপনার ব্যক্তিত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড লাঙ্গুলের মত কটিদেশে জড়াইয়া পরিধান করিতেন, উল্লম্ফনে চলিতেন, ফলমূলাদি ছাড়া অপর কোন দ্রব্যই আহার করিতেন না এবং নিরন্তর 'রঘুবীর' 'রঘুবীর' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চাৎকার করিতেন। এইরূপ সাধন কালে তাঁহার পঞ্চবটীতলে অনেকানেক দেব দেবী ও জ্যোতিঃ দর্শন হয়।

পঞ্চবটীর নিকটবর্ত্তী হাঁসপুকুর তখন ঝালান হইয়াছে এবং পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিম্ন জমীখণ্ড

ঐ মাটীদ্বারা সমতল করান হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত ধ্যান ভূমির আমলকী বৃক্ষটী নষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর বর্ত্তমান সাধন কুটীরের পশ্চিমে গদাধর স্বহস্তে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের চারা রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বট, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা বসাইয়া সমগ্র স্থানটীকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। এই সযত্ন রোপিত তুলসী ও অপরাজিতা গাছগুলি এত ঘন হইয়া উঠিয়াছিল যে উহার মধ্যে কেহ উপবিষ্ট থাকিলে বাহির হইতে তাঁহাকে দেখা দুঃসাধ্য ছিল। এইরূপে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠার পর গদাধর মথুর বাবুর সহিত তীর্থভ্রমণ কালে সংগৃহিত শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ আনয়ন করিয়া উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধন কুটীর মধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিয়াছিলেন "আজ হইতে এই স্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য হইল।" অতঃপর একদিন মথুরবাবুকে বলিয়া নানা স্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া সমস্ত দিন কীর্ত্তনানন্দের পর উহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং

যথেষ্ট দক্ষিণা দিয়া গদাধর উক্ত স্থানকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে তিনি মাধবী ও মালতীলতার গাছ আনিয়া পঞ্চবটীতে রোপণ করিয়াছিলেন। তৎকালে সাধনকুটীর একটী আটচালা ঘর ছিল। গদাধর সাধনকালে উহার ভিতর বসিয়া সাধন করিতেন। উহার বাঁশ, দড়ী এবং চালা ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রায়ে একদিন গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া পঞ্চবটীর সন্মুখে উপনীত হয়।

কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কথা যখন প্রচার হইয়া পড়িল তখন হইতে গঙ্গাসাগর ও পুরুষোত্তম দর্শনাকাঙ্ক্ষী সাধু সন্ন্যাসীগণ পথিমধ্যে শ্রদ্ধাসম্পন্না রাণী রাসমণির এই দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া দক্ষিণেশ্বরে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া যাইতেন। এইরূপে সমাগত সন্ন্যাসীগণের কাহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া গদাধর কয়েকদিন হটযোগ অভ্যাস করিতে থাকেন; পরে এযুগে উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার অভাব উপলব্ধি করিয়া ঐ সাধন পরিত্যাগ করেন। এই উপলক্ষে গদাধরের মুখ দিয়া কিছু রক্ত বাহির হইয়া পড়ায় তিনি জড় সমাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান।

এই সময়টী গদাধর তাঁহার বিচিত্র, অশ্রুতপূর্ব্ব

নিজস্ব অভিনব পূর্ব্ব বর্ণিত প্রণালীতে কাঞ্চনানুরক্তি, অসমজ্ঞান, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্যাগ ও সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন অন্তর হইতে বাহিরেও বদ্ধমূল করিয়া লন। তিনি বলিতেন এইরূপ সাধনকালে তাঁহার অন্তরস্থিত গুরুসত্ত্বা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সাধনের পথ নির্দ্দেশ ও উৎসাহ দান করিতেন।

রাণী রাসমণির মৃত্যুর কিছুকাল পরে সন ১২৬৭ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে কালীবাটীর পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যান সমন্বিত পোস্তার উত্তর ভাগে বকুল বৃক্ষ শোভিত বকুলতলার ঘাটের নিকট একদিন প্রাতে গদাধরের পুষ্পচয়নকালে গৈরিক বসন পরিহিতা আলুলায়িত কেশা, ভৈরবী বেশধারিণী, প্রায় চল্লিশবর্ষ বয়স্কা এক সুন্দরী রমণী আসেন। তৎকালে গদাধর তাঁহাকে দেখিয়াই আত্মীয়ের ন্যায় বোধ করিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বীয় কক্ষে আসিয়া হৃদয়কে দিয়া ভৈরবীকে ডাকিয়া পাঠান; বিস্ময়াভিভূতা ভৈরবী সজল নয়নে সহসা বলিয়া উঠিলেন "বাবা তুমি এখানে রহিয়াছ? আমি তোমাকে গঙ্গাতীরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।" গদাধরের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতির বিষয় ভৈরবীর অবগতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভৈরবী

বলিলেন "তোমাদের তিনজনের সঙ্গে আমার দেখা করিতে হইবে একথা জগদম্বার কৃপায় পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুইজনের সহিত দেখা হইয়াছে, অদ্য তোমার সহিত দেখা হইল।" কিছুদিন পরে গদাধর কর্তৃক নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়া ভৈরবী কালীবাটীর উত্তরে ভাগিরথী তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামস্থ দেবমণ্ডলের ঘাটে বাস করিতে থাকেন।

যোগ্য ব্যক্তির শিক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইলে গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ স্বতঃই উদয় হয়। এ ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণী তাঁহার আজীবন স্বাধ্যায় ও তপস্যার ফল স্বল্পকালের মধ্যে গদাধরকে উপলব্ধি করাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়া উপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করিয়া উহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। মনুষ্য প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণীর শির কঙ্কাল সযত্নে সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরবাটীর উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং গদাধরের স্বহস্ত প্রোথিত পঞ্চবটী তলে সাধনানুকূল দুইটী বেদী নির্ম্মিত হইল এবং প্রয়োজন মত ঐ মুণ্ডাসন দ্বয়ের অন্যতরের উপর উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে গদাধর নিমগ্ন থাকিয়া কয়েক

মাস অতিবাহিত করিলেন। দিবাভাগে তন্ত্র নির্দিষ্ট দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সমূহ আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণী রাত্রি কালে পঞ্চবটীমূলে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া গদাধরকে উহার সাধনে প্রবৃত্ত করিলে গদাধর ক্রিয়া সমাপনান্তে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের প্রথা আছে উহার সকলগুলি এক এক করিয়া গদাধর এইরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতঃপর তন্ত্রোক্ত সর্ব্বকঠিন সাধন করাইবার কালে ব্রাহ্মণী পূর্ণযৌবনা এক সুন্দরী যুবতীকে আনিয়া ৺দেবীর আসনে বসাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করাইয়া তাহার ক্রোড়ে বসিয়া গদাধরকে জপ করিতে অনুরোধ করেন। গদাধর তখন কাতরভাবে জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঐ রমণীর ক্রোড়ে বসিবা মাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইলে ব্রাহ্মণী বলিলেন "ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে, বাবা।" তারপরে একদিন ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রন্ধন করিয়া তদ্দারা শ্রীশ্রীজগন্মাতার তর্পণ করিয়া উহা গ্রহণ করাইলেন; অপর একদিন গলিত আমমাংসখণ্ড আনিয়া ঐরূপ তর্পণান্তে জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতে বলিলে

বেলতলা বা পঞ্চমুণ্ডির আসন।

গদাধর কিঞ্চিৎ ঘৃণাবোধ করায় ব্রাহ্মণী নিঃসঙ্কোচে উহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া গদাধরকে উহা ঘৃণাশূন্য অন্তরে গ্রহণ করিতে বলায় গদাধর শ্রীশ্রীজগজ্জননীর চণ্ডিকা মূর্ত্তির উদ্দীপনায় "মা মা" বলিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলে ব্রাহ্মণী উহা তাঁহার মুখে প্রদান করায় কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া গদাধরের পূর্ণাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। তৎপরে স্মুরত ক্রিয়াসক্ত নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্ব্বক গদাধর শিবশক্তির লীলাবিলাস জ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হওয়ার পর ব্রাহ্মণী বলিলেন "বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে।" উহাই এই মতের শেষ সাধন। উহার কিছুকাল পরে ভৈরবীকে ১০ পাঁচ সিকা দক্ষিণা প্রদান করিয়া গদাধর নাটমন্দিরে সর্ব্বজন সমক্ষে কুলাচার পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। যশোহরবাসিনী শাস্ত্র পারদর্শিনী এই ব্রাহ্মণীই সর্ব্বপ্রথমে গদাধরকে মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া সিদ্ধান্ত ও প্রচার করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ ধারণ করিয়া থাকেন শুনিয়া এবং কুকুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া গদাধর ঐ কালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে

পবিত্র বোধে গ্রহণ করিতেন। এইরূপ তান্ত্রিক সাধনাতে তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পর ভক্তিমান মথুরবাবু বহু ব্যয় করিয়া গদাধরের অভিলাষানুসারে অন্নমেরুর অনুষ্ঠান করেন। তন্ত্রোক্ত সাধনকালে গদাধর উহাতে সিদ্ধি লাভের জন্য নিষ্ঠা সহকারে রক্তবস্ত্র, বিভূতি, সিন্দূর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিক সাধনার পর গদাধর কিছুকাল ধরিয়া বৈষ্ণবমতের সাধন সকল করিয়াছিলেন। সাধন কালের প্রথম চারি বৎসর বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য প্রভৃতি এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামাদি ব্রজ-বালকের ন্যায় সখ্য-ভাব অবলম্বনে গদাধর সাধনে স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাধনকালে উক্ত ভাবানুকুল ভেক ও মাল্য চন্দনাদি অপরাপর বেশভূষা ও শ্বেতবস্ত্র শ্বেত চন্দন ও তুলসী তিলকাদিতে তিনি নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়া রাখিতেন। অতঃপর ১৭৭০সালে জটাধারী নামক রামাইত সাধুর আগমন হয়। তৎকালে উক্ত সাধুর আনন্দময় বাল-বিগ্রহ রামলালার প্রতি অপূর্ব্ব নিষ্ঠা দেখিয়া গদাধর তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। জটাধারী যে রামলালার

আনন্দময়মূর্ত্তি সর্ব্বদা দর্শন করেন, একথা তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর গদাধরের দৃষ্টি কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার অন্তরের গূঢ় রহস্য অবধারণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই কুলদেবতা রঘুবীরের যথারীতি পূজা ও সেবাদি সম্পন্ন করিবার জন্য রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও এতদিন তিনি তাঁহার এই রামাৎ সাধনে বিশেষ মনোযোগী হয়েন নাই। গোপাল মন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে সাহ্লাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তদ্ব্যতীত জটাধারী রামলালা নামক বালবিগ্রহ গদাধরকে দিয়া গিয়াছিলেন; উহা এক্ষণে দক্ষিণেশ্বরে ৺মাতার সিংহাসনের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। ইহার কিছুকাল পরে গদাধর মধুরভাব সাধন করেন; স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে সজ্জিত করিতেন; কখন ৺কাত্যায়ণীর নিকট ব্রজ-বালিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাইবার নিমিত্ত করুণভাবে ক্রন্দন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহের প্রবল প্রভাবে হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় এই সময় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায় তাঁহার

দেহ কখন কখন মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত, দেহের গ্রন্থিসকল এককালে শিথিল হইয়া যাইত। শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া গদাধর তৎকালে তদ্গত চিত্তে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে শ্রীমতী রাধারাণীর ন্যায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়; ভক্তিশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের ঊনবিংশতিপ্রকার লক্ষণ এইসময়ে তাঁহার দেহে দৃষ্ট হইয়াছিল। পরে মধুরভাবের পরাকাষ্ঠা লাভে ভাবরাজ্যের চরমভূমিতে উপনীত হইবার পর ভাবাতীত অদ্বৈত ভূমিতে গদাধরের মন অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক।

তৎকালে রাসমণির ঠাকুরবাটীতে ভিক্ষার সুবিধা ছিল; সাধুসন্ন্যাসীদিগকে প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সিধা দেওয়া হইত এবং ভাগিরথী তীরে গমনাগমনের সুবিধা থাকায় সাগর ও শ্রীক্ষেত্রযাত্রী পথিক সাধু তপস্বীগণ প্রায়ই পথিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অস্থায়ীভাবে বাস করিতেন। এইসূত্রে সন ১২৭১ সালের ৩১শে শ্রাবণ শ্রীমৎ তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে

শুভাগমন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মবিদ সন্ন্যাসী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ তোতা পুণ্যতোয়া নর্ম্মদাতীরে বহুকাল একান্তে সাধন ভজনে নিমগ্ন থাকিয়া সমাধি পথে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবার পর কিছুকাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের পর সঙ্কল্পের প্রেরণায় তিনি তীর্থান্তরে ভ্রমণের জন্য নির্গত হইয়া সাগরসঙ্গমে স্নান ও পুরুষোত্তম জগন্নাথ দর্শনান্তে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ফিরিবারকালে ভগবদিচ্ছায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমেই কালীবাটীর চাঁদনীতে আসিয়াই ভাবনিমগ্ন গদাধরকে তথায় একপার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বেদান্ত সাধনের উত্তমাধিকারী বলিয়া চিনিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাকে উত্তমাধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্তসাধন করিবে?" এই প্রশ্নে গদাধর উত্তর করিলেন "আমি কিছু জানি না, মায়ের আদেশ হইলে করিব।" তৎপরে গদাধর জগজ্জননীর নিকট ভাবাবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তোতাপুরী গোস্বামীর নিকট নিবেদন করিলে তোতা পঞ্চবটীতলে ধূনি জ্বালাইয়া নিজাসনে অবস্থিত থাকিয়া

গদাধরকে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তোতা শুভদিনে গদাধরকে দিয়া পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনান্তর নিজ আত্মার তৃপ্ত্যর্থে যথাবিধি পিণ্ডদান করাইলেন। তৎপরে গদাধর সংযতভাবে পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধন কুটীরে গুরুনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর নিশাবসানে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুরুশিষ্য উভয়ে ঐ কুটীরে সমাগত হইয়া হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া শিষ্য চিরপবিত্র ত্যাগব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন শুদ্ধোচ্চারিত মন্ত্রসকলের পূতগম্ভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটী উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল। এইবারে সন্ন্যাসের পূর্ব্বসম্পাদ্য বিরজা হোম সমাপন হইলে, ভক্তিসিদ্ধ গদাধর শিখা, সূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কাষায়, কৌপীন ও গুরুদত্ত নামে ('শ্রীরামকৃষ্ণপুরী') ভূষিত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। নবীন সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ গুরুর উপদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; প্রথম প্রথম তোতার নিকট সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণে যতই তিনি নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপের ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ততই তাঁহার জগদম্বার চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল

মূর্ত্তির দর্শন হইতে থাকায় তোতা কোপান্বিত হইয়া তাঁহার ভ্রূমধ্যে সজোরে কাচখণ্ড ফুটাইয়া দিবার পর রামকৃষ্ণ জ্ঞান অসিদ্বারা উক্তমূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ডিত করিবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই প্রকারে রামকৃষ্ণের সমাধি হইলে তোতা অনেকক্ষণ শিষ্যের নিকট উপবিষ্ট থাকিয়া নিঃশব্দে কুটীরের বাহিরে আগমন করিয়া পাছে অজ্ঞাতে কেহ ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া রামকৃষ্ণকে বিরক্ত করে এজন্য কুটীরদ্বারে তালা লাগাইয়া অদূরে পঞ্চবটীতলে শিষ্যের সমাধিভঙ্গের প্রতীক্ষায় রহিলেন। প্রতীক্ষা করিতে করিতে রাত্রি আসিল পুনরায় দিন হইল, এইরূপে দিনের পর দিন গিয়া ৩ দিন অতিবাহিত হইলেও যখন তোতা দেখিলেন যে রামকৃষ্ণ দ্বার খুলিবার জন্য ডাকিতেছেন না তখন তিনি বিস্মিত কৌতূহলে আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। স্বয়ং রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া তোতা কুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন অবস্থায় বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন সেই অবস্থাতেই তিনি বসিয়া আছেন দেহে প্রাণের প্রকাশমাত্র নাই কিন্তু মুখমণ্ডল প্রশান্ত গম্ভীর জ্যোতির্ম্ময়। সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিত হৃদয়ে

তাঁহার চল্লিশ বৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনার ফল শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিনে আয়ত্ত করিতে দেখিয়া সন্দেহাবিষ্ট হইলেন এবং সেই সন্দেহের বশে নানা প্রকারে রামকৃষ্ণের দৈহিক লক্ষণ সকল অনুধাবন করিয়া যখন তাহাতে কিছুমাত্র বিকার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলেন না তখন বিস্ময়ে ও আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "একি অদ্ভুত মায়া!" রামকৃষ্ণের ঈদৃশী সাধন তৎপরতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তোতা, যিনি ৩ দিনের অধিককাল কোথাও থাকিতেন না, তিনি একাদিক্রমে এগার মাসকাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিলেন।

এই সময়কার দক্ষিণেশ্বরে সংঘটিত কয়েকটী ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনেতিহাসের সহিত তত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট না হইলেও সেই বক্তব্যের বিশেষ পরিপন্থী না হওয়ায় তীর্থমাহাত্ম্যের অনুকূল জ্ঞানে আমরা স্মরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি প্রধান কয়টী এই :—ভৈরব দর্শন বৃত্তান্ত —তোতা অনেক সময় ন্যাংটা নামে পরিচিত হইয়া থাকেন—সেই ন্যাংটা পঞ্চবটীতে কাষ্ঠাহরণ করিয়া ধূনি জ্বালাইয়া আসন করিতেন—কি রৌদ্রে, কি বর্ষায় ন্যাংটার ধূনি সমভাবেই জ্বলিত, আহার ও শয়ন

ইত্যাদি তিনি ধূনির পার্শ্বেই করিতেন। গভীর নিশীথে বাহ্যজগত যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিত ন্যাংটা তখন ধুনি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ নিজাসনে বসিয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরমনকে সমাধিমগ্ন করিতেন। এইরূপ গভীর নিশীথে তোতা একদিন ধুনি উজ্জ্বল করিয়া ধ্যানে বসিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় সহসা পঞ্চবটী বৃক্ষশাখা সকল আলোড়িত করিয়া এক দীর্ঘাকার মানবাকৃতি উলঙ্গ পুরুষ তোতার ধুনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন ; তোতা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কে তুমি ?" উত্তর হইল "আমি দেবযোনী ভৈরব ; এই দেব স্থান রক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি ;" পরে নির্ভীকভাবে তাহাকে তাঁহার নিকট বসিয়া ধ্যান করিবার কথা বলাতে পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে মিশাইয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার পরদিন রামকৃষ্ণকে বৃত্তান্তটী বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ, আমি উহাকে অনেক বার দর্শন করিয়াছি ; কখন কখন কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয়ও উনি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন।"

মাতৃদর্শন বৃত্তান্ত :—বেদান্তবাদী শ্রীমৎ তোতা

রামকৃষ্ণদেবের বালকবৎ মাতৃনির্ভরতায় আপন অনবনত অদ্বৈতভাবে ব্যথা পাইতেন। একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ৺মায়ের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করায় মায়ের সিদ্ধ সন্তান রামকৃষ্ণ বিশ্ব-প্রসবিনীকে গুরুর ভ্রম নিরাকরণের জন্য ধরিয়া বসিলেন। তখন গভীর রাত্রিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাতৃ-মন্দিরের পশ্চাতে যাইবার জন্য মায়ের আদেশ শ্রীরাম-কৃষ্ণ গুরুকে জানাইলে তোতা অকুতোভয়ে যথা সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সেখানে সহসা অকারণে পড়িয়া গিয়া এমন সাংঘাতিক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন যে যন্ত্রনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। গুরুর সেই দুর্দ্দশাদৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া মাকে জানাইবামাত্র তোতা আবার সর্ব্বশক্তিময়ীর অদৃশ্যশক্তির খেলায় অকস্মাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন। এই ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণকে তোতা বলিয়াছিলেন "আমি তোমার গুরু নই, বাবা, তুমি আমার গুরু! এইবারে আমার শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান সরস হইল।"

পুষ্পোপাখ্যান :—এই সময়েই হউক বা কিছুকাল পরেই হউক ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা লইয়া রামকৃষ্ণ-দেবের মথুরবাবুর সহিত তর্ক হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুর

বাবুর কথার প্রতিবাদে ভগবান যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তাহা অস্বীকার করেন এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ পরদিন লাল জবাবৃক্ষে শ্বেতজবা ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়া সানন্দ উৎসাহে রামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুকে ডাকিয়া তাহা দেখান। ফলে মথুরবাবু মুগ্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণে অধিকতর শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসবান হইয়া পড়েন।

এইরূপ ক্ষুদ্রমহান আরও অনেক ঘটনা দক্ষিণেশ্বরে তৎকালে ঘটিয়াছিল; এখানে ওখানে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে ঘটনা-বলীর ধরণ ও প্রকৃতি অবগত করাইবার জন্য ঐ তিনটী মাত্র ঘটনার সংক্ষেপ উল্লেখ ও বর্ণনা উপহার দিয়া আমাদিগের পূর্ব্ববক্তব্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। বেদান্ত সাধনের কিছুকাল পরে রামকৃষ্ণদেব গোবিন্দ-রায় নামক জনৈক মুসলমান সাধকের নিকট যথারীতি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কোরাণ পাঠ শ্রবণ ও তদুক্ত প্রণালীতে সাধন ভজন করিতে উৎসাহ ও নিষ্ঠা সহকারে লাগিয়া যান। গোবিন্দরায় জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন তিনি নানা ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়া পরিশেষে ক্ষাত্রধর্ম্ম ইসলামের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া

যথারীতি দীক্ষিত হন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উহা সাধনানুকুল স্থান দেখিয়া পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় কিছুকাল সাধন করিলে পর শ্রীরামকৃষ্ণ উক্তভাব সাধনে অভিলাষী হইয়াছিলেন এই সাধনকালে তিনি "আল্লাহ" মন্ত্র জপ করিতেন; মুসলমান দরবেশগণের ন্যায় পোষাক পরিধান করিতেন; পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়িতেন; হিন্দুদেবদেবীর প্রণাম দূরে থাক দর্শন পর্য্যন্ত করিতে তখন তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। ঐকালে তাঁহার মুসলমানদিগের খাদ্য সকল আহার করিতে ইচ্ছা হইলে মথুরবাবু মুসলমান বাবুর্চ্চী আনাইয়া তাহার নির্দ্দেশমত এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানী প্রণালীতে রন্ধন করাইয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিতেন ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠীবাড়ীতে থাকিতেন। এ সাধনেও সিদ্ধ হইতে তাঁহার তিন দিনের বেশী লাগে নাই।

ইহার পরে যীশুখৃষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থার ছবি দেখিয়া যীশুখৃষ্টের উদ্দীপনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া খৃশ্চান ধর্ম্মমতে নির্দ্দিষ্ট মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করেন। সে বিষয়ে তিনি পরজীবনে যাহা বলিয়া ছিলেন শ্রীমলিখিত কথামৃতে তাহা আমরা দেখিতে

পাই। স্থান ও সময়াভাবে আমরা আর তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া আসলকথাটী বলিলাম; খৃশ্চান সাধনে তিনি স্বয়ং গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই সময়েরই কোন অংশে শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধার্থের আলেখ্য দর্শনে বুদ্ধদেবের উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার মার জয় ত হইয়াই ছিল, কাজেই ইহাতে বৈশিষ্ট কিছু ছিল না। বৌদ্ধসাধনে সিদ্ধ হিন্দুর অনধিকার নাই, অতএব কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ও সম্ভব নহে—বুদ্ধও ত হিন্দু।

এই সকলের পরে সন ১২৮০ সালে ফলহারিণী পূজার অমাবস্থার রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিবার মানসে বিশেষরূপ আয়োজন করিয়াছেন মন্দিরে না হইয়া সংগোপনে তাঁহার ঘরেই আয়োজন হইয়াছে। নিশি সমাগতা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিলেন। এইসময়ে জননী চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরের উত্তর দিককার নহবৎখানার নীচের ঘরে এবং স্ত্রী সারদামণি শ্বশ্রু ও স্বামীর সেবার্থে দক্ষিণেশ্বরেই বাস করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব পূজায় বসিবারকালে

সারদামণি (শ্রীশ্রীমা) সেই প্রকোষ্ঠেই উপস্থিত ছিলেন। পূজক এইবার আলিম্পন ভূষিত পীঠে সহধর্ম্মিণীকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করায় শ্রীশ্রীমা অর্দ্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দক্ষিণাস্য হইয়া উপবিষ্টা হইলে, সম্মুখের কলসস্থিত মন্ত্রপূত গঙ্গোদকে তাঁহাকে যথারীতি অভিষিক্তা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীঅঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাস পূর্ব্বক সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। তখন বাহ্যজ্ঞানতিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলে রামকৃষ্ণ জপেরমালা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব তাঁহার পাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণামান্তর পূজা শেষ করিলেন।

এইখানে আমরা দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে আরও দুই একটী স্মরণীয় কথা পাঠক পাঠিকাগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। একটী তাঁহার পরিপূর্ণ মাতৃভক্তির বিকাশ এবং আর একটী তাঁহার ও সারদা-মণির মহিমান্বিত দাম্পত্য জীবনের আদর্শ। (১) জনকজননী সংসারে শ্রীভগবানের বিগ্রহমূর্ত্তি। শ্রীরাম-কৃষ্ণ তাই তাঁহার সেই ইষ্টদেবী জননী দক্ষিণেশ্বরে আছেন বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করার সঙ্কল্প উদয়

হওয়ামাত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদ্বাদে পাছে জননী চন্দ্রাদেবী অন্তরে আশঙ্কা বা দুঃখ পান বলিয়া তিনি সন্ন্যাসের লৌকিক অভিব্যক্তি যে গৈরিক বসন তাহা সাধনান্তে ত্যাগ করিবার ভিক্ষা গুরু তোতাপুরীর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার ও সারদামণির সেবা ভোগ করিয়া সার্থক জননী চন্দ্রাদেবী গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন।

(২) সারদামণি শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্তা পত্নী ছিলেন। ঈশ্বরকোটী শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার আপন মনোবৃত্তানুসারিণী পত্নী লাভ করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি! সাধনকালের প্রথম ভাগে দ্বিতীয়বার যখন রামকৃষ্ণদেব কামারপুকুরে গিয়াছিলেন তখনই পত্নী সারদামণির অন্তরে আপন স্বধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া আসিয়াছিলেন; তাহাই অঙ্কুরিত হইলে পল্লীবালা সারদামণি দক্ষিণেশ্বরের বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীমতীর ন্যায় লজ্জা, ভয়, গৃহপরিজন ত্যাগ করিয়া পথের নানা বাধা ও কষ্ট অতিক্রম করিয়া পতির চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরই শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সারদামণিরও সাধনপীঠ। এইখানেই নারায়ণের চরণে লক্ষ্মী স্বমহিমায় বিকশিতা হইয়া উঠিলেন। সারদামণির

অন্তরের অঙ্কুরিত বীজ পল্লবিত ও ফলে ফুলে পরিণত হইয়া উঠিল। তখনকার শিব ও শক্তির সেই অপূর্ব্ব দাম্পত্য জীবন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণির সেবা সানন্দে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেছেন, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেছেন, উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেছেন, মাতাপুত্রের ন্যায় নিশ্চিন্তমনে এবং ভ্রাতাভগ্নীর ন্যায় নিঃসঙ্কোচে। পরজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ থাকিতেন পুরুষ ভক্তগণকে লইয়া এবং স্ত্রীভক্তগণকে পাঠাইয়া দিতেন শ্রীশ্রীমার নিরাপদ আশ্রয়ে। পুরুষ ও প্রকৃতি জগতে নিরন্তর তাহাই ত করিতেছেন; আমরা 'স্বখাদ সলিলে' ডুবিয়া মরিতেছি মাত্র। যুগল কাণ্ডারী পরস্পরের অন্বেষণ করিতেছেন; একবার ফিরিয়া চাহিলেই চারি চক্ষের মিলনে সব গোল মিটিয়া যায়; কালী ও মহাকালের সে মিলন দিন "আসিবে সেদিন আসিবে।"

স্বয়ংসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণদেব একে একে সকল সাধন লোকশিক্ষার জন্যই যেন সমাপন করিয়া পরমহংস অবস্থা লাভ করিলেন; এবং সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরেই আপন ভোলা বালকটীর মত পরমানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরকোটী শ্রীরামকৃষ্ণ

সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরীয় ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন আর মধ্যে মধ্যে সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু কৃপা বিতরণের জন্য পাত্রানুসন্ধান করিতেন। এইখান হইতেই তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন ও অনেকানেক ভক্ত বৈষ্ণব ও সাধুগণের কথা লোকমুখে শুনিয়া মথুরবাবুর সঙ্গে তাঁহাদের দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মথুরবাবু ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট চিহ্নিত সেবক এবং হৃদয় ছিলেন তাঁহার দেহরক্ষী।

অতঃপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মধ্য দিয়াই পরমহংস দেব নবীন বাংলার রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। সেকথা আজকাল আর নূতন বা বিচারসাপেক্ষ নহে তাহা সিদ্ধ সত্য। এই দক্ষিণেশ্বরেই ব্রহ্মানন্দের নববিধানের উৎসমূল। এইখানেই 'খাপখোলা তলোয়ার' নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হইলেন। তবে আর বাংলার বাকী রহিল কি? নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ এইখানেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া বকলমা দিয়া ধন্য হইলেন। এই দক্ষিণেশ্বরেই সাধু নাগ মহাশয়ের ভক্তিগঙ্গা উছলিয়া উঠিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এখন হইতে ভক্তাধীন হইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরীয় কথা, নামগান, কীর্ত্তন,

নৃত্য, আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া নবীন বাংলার কর্ণধার ভক্তগণকে লইয়া প্রেমের সংসার পাতিয়া বসিলেন। প্রেমময় ঠাকুর এখান হইতে মধ্যে মধ্যে ভক্তভবনে গমন করিতেন, ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, অভিনয় দর্শন করিতে কয়েকবার গিয়াছিলেন আর যাইতেন দেবদেবী বা ভক্তদিগকে দর্শন করিতে। এ সকলের মধ্যেই যে তাঁহার কাজ ছিল কৃপাবিতরণ তাহা আর না বলিলেও চলে। এইরূপে জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, শুচি অশুচি, হিংসা অহিংসা প্রভৃতি সর্ব্বাতীত ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করিতে করিতে ঠাকুর আপন লীলাবসানে সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ (ইংরাজী ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট) ৫২ বৎসর বয়সের সময় দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে ভুগিয়া বরাহনগরে মহা সমাধিমগ্নাবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মও হয় নাই বা দেহাবসানও ঘটে নাই ; অথচ তাঁহার জীবনের যাবতীয় ঘটনাই প্রায় দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতির সহিত অল্প বিস্তর বিজড়িত। ইহাও একটী চিন্তনীয় বিষয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। ঠাকুরের অমর জীবনই দক্ষিণেশ্বরের মূলধন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নিত্য বিরাজিত।

পাদ্য অর্ঘ্য।

ঠাকুরের সময়ে কালীবাটীর দেখাশুনার কাজ রাসমণির তরফ হইতে মথুরবাবুই করিতেন। উহার কয়েকবর্ষ পরে রাসমণির দেহত্যাগ হইলে মথুরবাবুর আমলেই রাসমণির জ্যেষ্ঠাকন্যা পদ্মমণি বৎসরাধিক কাল ধরিয়া সেবায়েৎ ছিলেন। রাসমণির উইলের সর্ত্ত অনুসারে বড় ছেলে বা বড় মেয়ের সেবায়েতের কার্য্য করার অধিকার থাকায় পদ্মমণি দাসী সেবায়েৎ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পদ্মমণি সেবার কার্য্য হইতে বিরত হইলে মথুরবাবু ও পরে মথুরের স্ত্রী জগদম্বা ৫।৭ বৎসর ধরিয়া সেবায়েতের কার্য্য করেন। জগদম্বার মৃত্যুরপর তৎপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের হস্তে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল। তিনি প্রায় ত্রিশ বর্ষকাল সুচারুরূপে তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কালীবাটীর অনেক সংস্কার সাধিত হয়; কারণ ত্রৈলোক্যবাবুও তাঁহার পিতা মথুরবাবুর ন্যায় দেবদ্বিজে সাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন; এবং তিনি স্বয়ং বহুদিন ধরিয়া ঠাকুরের সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনপুত্র বর্ত্তমান

রাখিয়া ত্রৈলোক্যবাবু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মারা যান।

ত্রৈলোক্যবাবুর মৃত্যুতে তদীয় পুত্র ব্রজগোপালের হস্তে দক্ষিণেশ্বরের দেখাশুনার ভার ন্যস্ত হয়। তিনি মাত্র ৭।৮ মাস কার্য্য করিতে করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। ব্রজগোপালের মৃত্যুর পর গুরুদাসবাবু ও চণ্ডীবাবু একতরফে এবং অপর তরফে বলরামবাবু এক বৎসর যাবৎ সেবায়েতের অধিকারের জন্য মোকর্দ্দমা করেন। বলাইবাবু অতিশয় কৃষ্ণানুরাগী ছিলেন, বৈষ্ণবভাব তাঁহার প্রিয় ছিল; সেই নিমিত্ত তাঁহার তত্ত্বাবধান আমলে তিনি কিছুকালের জন্য আপন মনোমত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বলিপ্রথা উঠাইবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; বলিস্থানে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন; এবং তাম্রপাত্রের পরিবর্ত্তে পিত্তলাদিধাতুর তৈজস মন্দিরে ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। যাহা হউক উপরোক্ত মোকর্দ্দমার ফলে ১৪৫ ধারা অনুযায়ী ছয়মাস পূর্ব্বের দখলীকারে সেবায়েতের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ায় গুরুদাসবাবু ও চণ্ডীবাবু সেবায়েত স্থির হইলে বলরামবাবু উহার বিরুদ্ধে রিসিভার নিয়োগের জন্য আদালতে

প্রার্থনা করেন এবং সেই প্রার্থনানুযায়ী আদালত হইতে মিঃ পি, চৌধুরী মহাশয় রিসিভার হইলেন।

পি, চৌধুরী মহাশয় অষ্টাদশ বর্ষকাল রিসিভারের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতেই সেবায়েতগণের দেবোত্তর সম্পত্তির উপর বিশেষ কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সময়ে বিশেষ সুব্যবস্থা কিছুই করিতে পারেন নাই; বরং তাঁহার কার্য্যকালের শেষ-ভাগে দেবোত্তর সম্পত্তিকে দেড়লক্ষ টাকা ঋণভারে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন যে দেবোত্তর সম্পত্তি বলিতে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা বুঝায়। ঐ জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় ৫৬০০০৲ টাকা। সদর খাজনা ২২০০০৲ টাকা ও অন্যান্য কর প্রায় ৬০০০৲ টাকা; এই ২৮০০০৲ টাকা রাজস্ব বাদে বৎসরে ২৮০০০৲ টাকা মুনফা। এই টাকার মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের সেবার জন্য বার মাসে ১২০০০৲ টাকা বরাদ্দ; এবং বাকী টাকার মধ্যে মহলের কাছারীর বারবরদারী বেতন ও অন্যান্য খরচের জন্য ১০০০০৲ টাকা বাদে প্রায় ৬০০০৲ টাকা দেবোত্তর জমিদারী শালবাড়ীতে ৺পটেশ্বরী দেবীর সম্বৎসরের সেবা ও পূজার জন্য বরাদ্দ। জমিদারীতে

পটেশ্বরী মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা উহার পূর্ব্বতন অধিকারী দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেখানে দেবীমূর্ত্তি একখানি বৃহদাকার পট। পটের একপার্শ্বে শ্রীশ্রীদুর্গা এবং অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীকালী মূর্ত্তি; উহা একগাছি রজ্জু অবলম্বনে শূন্যে ঝুলান আছে। ঐ দেবীর নিত্যপূজা, দোলযাত্রা ও অন্যান্য পর্ব্বোৎসবাদি হইয়া থাকে। দিনাজপুরান্তর্গত শালবাড়ী পরগণায় জমিদারীর সদর কাছারী। উহাতে ১৭টী ডিহি ও ৪১টী মৌজা আছে। উহার খাজাঞ্চী, কর্ম্মচারী ও পাইক বরকন্দাজ সব নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। উহাদের দেখাশুনার ভার ত্রৈলোক্য বাবুর সময়ে তিনি স্বয়ং করিতেন; পরে চৌধুরী মহাশয়ের আমলে তাঁহার ম্যানেজার করিত।

চৌধুরী মহাশয়ের অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী তত্ত্বাবধানে বিশেষ সুবন্দোবস্ত কিছু না হওয়ায় এবং দেবোত্তর সম্পত্তি সাতিশয় ঋণগ্রস্ত ও দেবস্থানাদির সংস্কারাভাব হওয়ায় দেবালয়ের উন্নতি ও গৌরবকামী ভক্ত সাধারণের ও বেলুড় মঠস্থ সন্ন্যাসীগণের মনে দেবালয়ের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য পুনরুদ্ধারের বাসনা জাগরূক হয়। এ সম্বন্ধে পরলোকগত বাবু কৃষ্ণমোহন দে ও

বেলুড় মঠের শ্রীমৎ নগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পূর্ব্বাবস্থা পুনরুদ্ধার সাধনে যত্নবান হয়েন। সার্দ্ধ দুই বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা পরস্পর মত-বিরোধী সেবায়েতগণের অধিকাংশকে স্বমতে আনয়ন করিয়া দেবালয়ের ঋণ ও তজ্জন্য উহার নিলাম বিক্রয়ের সম্ভাবনা ও সূচনা এবং সংস্কারাভাব ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া হাইকোর্ট হইতে নূতন রিসিভার নিয়োগের আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। সেই আদেশানুসারে মঠস্থ সন্ন্যাসীগণ ও ভক্ত সাধারণে মিলিয়া ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহোদয়কে নূতন রিসিভার মনোনীত করেন এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে হাইকোর্টেও তাহা মঞ্জুর হইলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কিরণবাবু কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

কিরণবাবু একজন বিশিষ্ট ভক্ত এবং উৎসাহী কর্ম্মী। কলিকাতার অনেকানেক ক্ষুদ্র বৃহৎ অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তিনি রিসিভারের দায়িত্ব গ্রহণ করা অবধি দেবালয়ের বহুতর সংস্কার করা হইয়াছে। পুরাতন বন্দোবস্ত উঠাইয়া নূতন সুবন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ফলে, এই অল্পকালের মধ্যেই দেড়লক্ষ টাকা ঋণের মধ্যে প্রায় ৪০।৫০. সহস্র

মুদ্রা ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীমৎ নগেন্দ্র ব্রহ্মচারী শালবাড়ী পরগণায় থাকিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেবালয়েরও অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারগুলি সমাপ্ত হইয়াছে; অবশিষ্ট সংস্কারকার্য্য, বর্ত্তমানে ঋণদায়ে আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হওয়ায় ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। কিরণবাবু রাসমণির সময়কার পূজা ও অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত রক্ষা করিতেছেন।

রাসমণির আমল হইতে হিন্দুর যাবতীয় পূজা-পার্ব্বনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতেও উহার রীতিমত অনুষ্ঠান অদ্যাবধি হইয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীকৃষ্ণের রাস, দোল প্রভৃতি, শিবরাত্রি, গ্রহণ, শ্রীশ্রীশ্যামার ফলহারিণীপূজা এবং স্নানযাত্রার দিন ও প্রত্যেক অমাবস্যাতে ৺কালীমাতার ও ৺গোবিন্দজীউর দৈনিক সেবা ভিন্ন বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অমাবস্যাতে ফলমূল নৈবেদ্য ব্যতীত একটী ছাগ, শ্রীশ্রীকালীপূজায় তিনটী ছাগ, একটী মেষ ও একটী মহিষ, স্নানযাত্রার দিন একটী ছাগ এবং শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের তিনদিনে তিনটী ছাগ এবং তদ্বাদে যাত্রী সাধারণের আনীত পশুও বলিদানের জন্য

উৎসর্গ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ ।৫ পনর সের চাউলের ভোগ হয়। দ্বাদশ শিবের কোন অন্নভোগ নিবেদন হয় না; উঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র নৈবেদ্যের বন্দোবস্ত আছে।

বর্ত্তমানে ঠাকুরবাটীতে ২৪জন বেতনভোগী এবং ২ জন অবৈতনিক কর্ম্মচারী আছেন। দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী ১ জন ও কর্ম্মচারী ১ জন। ভোগ ঘরের পাচক ২ জন। শ্রীশ্রীভবতারিণী ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজক ২ জন; ইঁহারা বেতনভোগী এবং ছয়টী করিয়া দ্বাদশ শিবের ২ জন পুরোহিত; ইঁহারা দেবালয় হইতে কোন বেতন পান না, যাত্রীগণ প্রদত্ত প্রণামী ইঁহাদের প্রাপ্য। প্রত্যেক মন্দিরশ্রেণীতে ১ জন করিয়া ৪ জন টহলদার। দ্বারবান ৭ জন, ভাণ্ডারী, ফরাস ও ভারী ১ জন করিয়া ৩ জন। ঝি ৪ জন, মালী ২ জন ও ঝাড়ুদার ১ জন। কর্ম্মচারীবৃন্দ ব্যতীত প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সাধারণ যাত্রী ও দরিদ্র নারায়ণের প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত আছে; বিশেষ পূজা ও উৎসবাদিতে আয়োজনের আধিক্য থাকায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত লোকেও প্রসাদ পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ ৺মাতার ভোগের নিমিত্ত সাধ্যমত প্রণামী দিয়াও

প্রসাদ পাইতে পারে; তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতে কর্ম্মচারীদিগকে জানান কর্ত্তব্য।

মন্দির সকল প্রাতঃকালে ৭॥০ বা ৮ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্নে ১২ বা ১২॥০টার সময় পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। তাহার পর মধ্যাহ্নের ভোগারতির পর দেবদেবীর বিশ্রামকালে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। অপরাহ্নে আবার ৩॥০ ঘটিকায় দ্বার মুক্ত হইয়া সন্ধ্যারতি ও রাত্রি-কালীন শীতলভোগ সমাপনান্তে ৮॥০ ঘটিকার সময় বন্ধ হয়। প্রত্যুষে ৫॥০ ঘটিকার সময় মঙ্গলারতি ও বাল্যভোগ হয়। পূর্ব্বে রাসমণির সময় হইতে ত্রৈলোক্য বাবুর সময়েও প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত নহবৎ বাজিত। বর্ত্তমানে উহা বন্ধ থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে উহার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার বাসনা কর্ত্তৃপক্ষ-গণের আছে। কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ ইচ্ছা, যাহাতে দেবালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়; এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে যখন কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে, তখন উহার পুনরুদ্ধার নিশ্চয়ই সাধিত হইবে।

বর্ত্তমানে দেবায়তনের সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহাতে পূর্ব্বশ্রীর হানি হইয়াছে বটে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ঠাকুরের সাধন কুটীর এখন আর চালাঘর নাই। উহা এখন পাকা করা হইয়াছে; ভিতরে ধ্যানস্থ মহাদেবের সৌম্যমূর্ত্তি বিরাজমান ও তন্নিম্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমার চিত্র বিরাজমান। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর বহু সাধুসন্ন্যাসী আসিয়া এই ঘরে অনেককাল ধরিয়া সাধন ভজন করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন এবং এখনও কাটাইয়া থাকেন। পঞ্চবটীর আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই; পঞ্চবৃক্ষের মধ্যে কেবল অমর বট ও অশ্বত্থ পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত বটবৃক্ষের নিম্নে একটী সুবৃহৎ বেদী রচনা করা হইয়াছে। ঐখানে ধূনি জ্বালাইয়া বহু তপস্বী সন্ন্যাসী অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। পঞ্চবটীতে ঠাকুরের ধ্যান নির্দ্দিষ্ট মূল বৃক্ষটী হইতে একটী শাখা বিস্তীর্ণ হইয়া কিঞ্চিৎ পশ্চিমে যাইয়া অপর একটী বৃক্ষের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল; উক্ত বৃক্ষশাখাটী সাধারণের চলিবার পথে মাথায় ঠেকিত বলিয়া বর্ত্তমানে কাটিয়া রাখা হইয়াছে। পঞ্চবটীর উত্তরপূর্ব্বকোণে পূর্ব্ববর্ণিত বেলতলা বা পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন। ঐখানে ঠাকুরের পর বিবেকানন্দ প্রমুখ বহুতর সাধুসন্ন্যাসী ধ্যান ও ভাব সমাধি লাভ করিয়া-ছেন। নবরত্ন মন্দিরের কয়েকটী চূড়া অনেককাল ভগ্ন

অবস্থায় ছিল; বর্ত্তমানে সেগুলির সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এইরূপ সংস্কার কার্য্যে পূর্ব্বেকার কারুকার্য্য গুলি যথাসাধ্য পুনর্গঠন করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণকে অধিকতর অবহিত হইতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। তাঁহাদের কৃত সংস্কার আমরা সকৃতজ্ঞ অন্তরে বরণ করিয়া লইতেছি ও লইব সন্দেহ নাই; তবে সংস্কৃত স্থানগুলি পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য না হারাইলে আমাদের কৃতজ্ঞতা সানন্দ হইবে, এই আকিঞ্চন।

বর্ত্তমানে পঞ্চবটীর পশ্চিমদিকে ভাগিরথীর তীর ধরিয়া বকুলতলার ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া একটী প্রাচীর বরাবর উত্তর সীমায় গিয়া শেষ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ আর একটি প্রাচীর দক্ষিণদিকে পোস্তার গাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেবালয়ের দক্ষিণ সীমায় আসিয়া শেষ হইয়াছে ঐ সকল বর্ত্তমান রেলওয়ে সেতুর কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের সেতুসংক্রান্ত কোন কার্য্যের সহায়তা কল্পে নির্ম্মিত হইয়াছে।

একথা যেমন সত্য যে সে রামও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই; তেমনিই আবার একথা সত্য যে সেই রামায়ণ আজও আছে। দক্ষিণেশ্বরে এত যে

পরিবর্ত্তন, এত যে শ্রীহানি সংসাধিত হইয়াছে, তথাপি স্থানের মাহাত্ম্য সেখানে পদার্পণ করিবামাত্র উপলব্ধি হয়। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে যে না দেখিয়াছে তাহার ত আর দেখিবার এখন মানস চক্ষে ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ; তবে দক্ষিণেশ্বরের চিহ্নিত স্থানগুলির মাহাত্ম্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করা আজও সম্ভবপর। শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিতা শ্রীশ্রীভবতারিণী ও শ্রীশ্রীরাধাকান্ত, ঠাকুরের নিভৃত কক্ষটী, পঞ্চবটী, বেলতলা, সাধনকুটীর আর গঙ্গার তীর—ইহার প্রত্যেকটীই দক্ষিণেশ্বরের সকল কথাই মনে জাগাইয়া দেয়। এক পঞ্চবটীই আজও শ্রীহীণা, হৃতসমৃদ্ধি ও খণ্ডিতা হইয়াও কি রম্যস্থান !

পঞ্চবটী যেন জননী জন্মভূমির সার্ব্বজনীন প্রতিভূ। উহাকে আদর্শ করিয়াই যেন আমাদের বাঙ্গালার সুন্দরী পল্লীজননী গড়িয়া উঠিয়াছে। বিমল সলিলা বহমানা ভাগিরথীর পার্শ্বে এই সঙ্কীর্ণ ভূমিটুকু নিদ্রিতা জননীর বক্ষের নিকট ক্রীড়ারতা, হাস্যময়ী, সুকুমারী শিশুকন্যার মত, বিস্তীর্ণ রাজপথে যেন একখণ্ড সুচারু উদ্যান লাগিয়া রহিয়াছে। নিশাশেষে যখন স্খলিত শিশিরসিক্ত মালতী, মাধবী, শেফালিকা প্রভৃতির

পুষ্পশয্যায় বালিকা পঞ্চবটী জননী জাহ্নবীর স্তন্যপান করে তখনকার মাতাপুত্রীর সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদ্ভাসিত নির্ব্বাক মুখচ্ছবি এই দেবভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী করিয়া তুলে। সেই নির্জ্জনতা তখন স্নেহ, করুণা ও শান্তির ভাষাহীন বাণীতে যেন গলিয়া পড়িতে থাকে। তাই পঞ্চবটী সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের ধ্যান ধারণা ও সাধন ভজনের এমন উপযুক্ত স্থান; মাতৃক্রোড় অপেক্ষা নিরাপদতর আসন আর কি থাকিতে পারে? তাই না বিশেষ বিশেষ ভক্ত সাধকগণ, কেহ নিকটবর্ত্তী বেলতলায়, কেহ পঞ্চবটীমূলে ধ্যানে নিমগ্ন! ক্রমে উষার মুদিত আলোর কমল কলিকাটী প্রভাতে ফুটিয়া উঠিল, সুরধুনী জননীর মমতাবিহ্বল স্নেহ, কম্পিত নয়নে চাহিয়া কন্যা পঞ্চবটী কলকণ্ঠে জাগিয়া উঠিল। প্রভাত সমীরণ কোকিলের কুহুস্বর, চাতকের সঙ্গীত বা পাপিয়ার ঝঙ্কার প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষীর কূজন, ভ্রমর গুঞ্জন ও জীব মাত্রের প্রভাত বন্দনার সাথে ৺ভবতারিণী মন্দিরের মঙ্গলারত্রিকের বিচিত্র বাদ্যধ্বনি মিলাইয়া দিল; সাধু সন্ন্যাসীগণ প্রাতঃস্নান সারিয়া স্তোত্রপাঠ ও ভজনগান সুরু করিয়া দিলেন। সমাধিমগ্না পঞ্চবটীর কণ্ঠে দেবভাষা স্ফুরিত হইল।

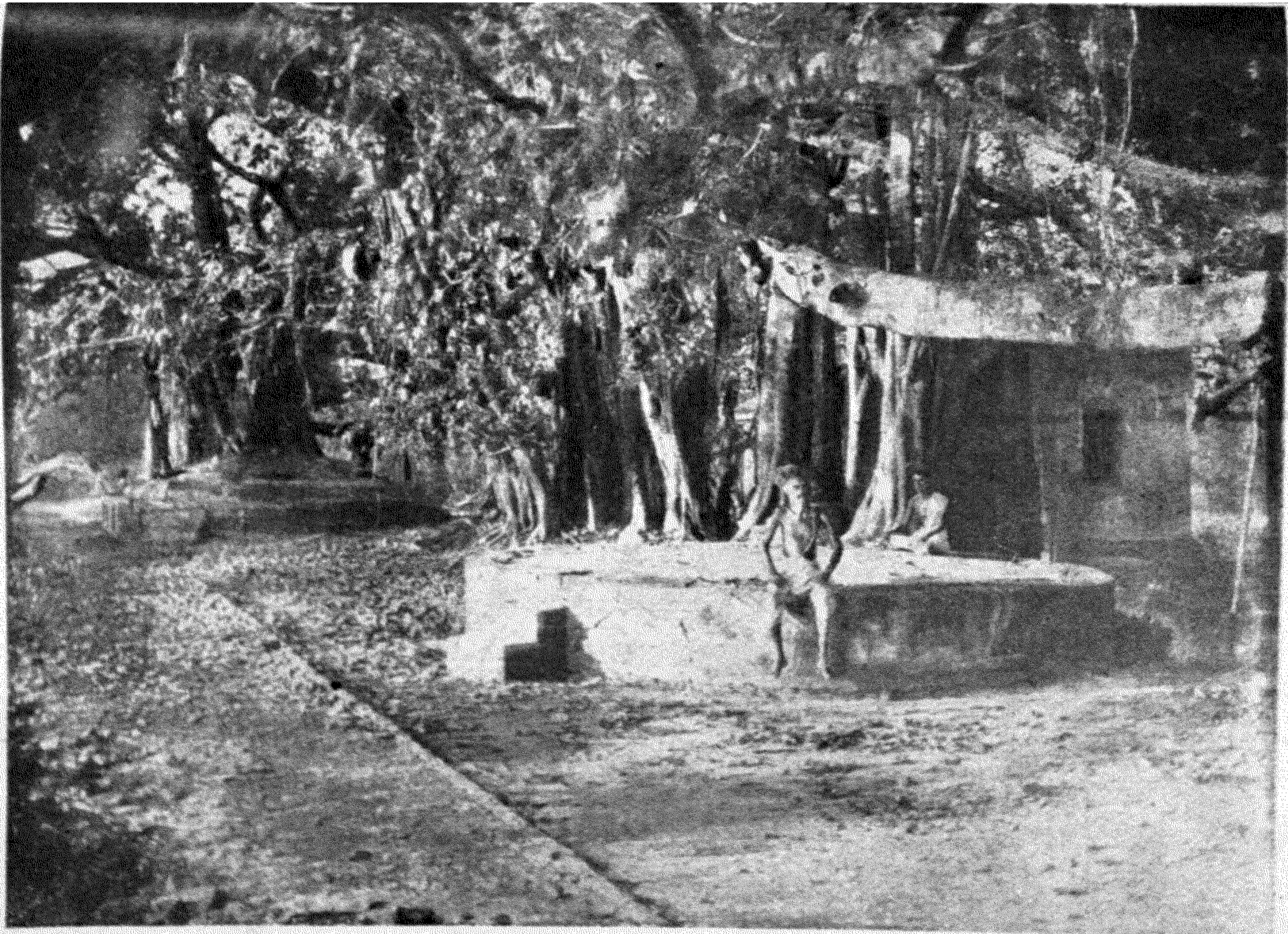

পঞ্চবটী ও শান্তিকুটীর (বেদান্ত সাধনার ঘর)

কূটস্থ মাতৃত্ব দিবসের কর্ম্ম কোলাহলে অঙ্কুরিত হইয়া আপন পরম পরিণতি লাভে অগ্রসর হইল; শেষে দিবাবসানে সন্তানের মঙ্গলকামনায় আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিলে পর তরুণ অরুণ আবার তাহাকে আবিষ্কার করিবে। এ হেন দেবভূমি পঞ্চবটীর সঙ্গে পবিত্রতায় ও মহত্ত্বে জন্মভূমি ব্যতীত অন্য কোন স্থানের তুলনাই হইতে পারে না। সর্ব্বোপরি জন্মভূমির স্নেহ মাতৃস্নেহের অনুরূপ; এমন স্বার্থলেশশূন্য, কলুষ-হীন, অমলিন স্নেহের নিদর্শন আর কোথাও মিলিবে না। স্নেহাধীনের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করিয়া তাহাকে আপনার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে হয় না—মাতা সন্তানকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিয়া আপনি সকল প্রকার দুঃখযন্ত্রণা বরণ করিয়া লইয়া নিজের জ্ঞানাজ্ঞান, সুখ দুঃখ, এমন কি ধর্ম্মাধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন। পঞ্চবটীতেও সেই পরিপূর্ণ ক্ষমা, ত্যাগশীল সহিষ্ণুতা ও নিষ্কাম প্রেমের বাণী, বিবেক বৈরাগ্য ও সত্য সরলতার মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে পঞ্চবটী জননী জন্মভূমির প্রতীক।

প্রণাম।

নিগমকল্পের পীঠমালায় দক্ষিণেশ্বর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত "কালীক্ষেত্র" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা :—

ঠাকুরের জীবনে প্রতিফলিত দর্শনশাস্ত্র।

"দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বেহুলাপুরী।
কালীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্রমভেদোঽস্তি
মহেশ্বরঃ॥"

সুতরাং "দক্ষিণেশ্বর" হিন্দুর একটী শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণনীয় হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের নিকট দক্ষিণেশ্বরের তীর্থগৌরব এইরূপ শাস্ত্রীয় সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নহে। "আবাহনে" আমরা আমাদের যুক্তির নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমগ্র জীবনই দক্ষিণেশ্বরের পক্ষ হইতে জাতিকে—তথা বিশ্বকে—শ্রীভগবানের দক্ষিণ হস্তের দান। হয় কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, নয় কোন বিখ্যাত দেবায়তন, নয় কোন বিশেষ ধর্ম্মমত বা সত্যের একদেশীয় দর্শন অথবা কোন মহাপুরুষের জীবনলীলাই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানকে তীর্থ করিয়া তুলে। পৃথিবীর সকল তীর্থক্ষেত্রেই ঐরূপ

কোন না কোন গুণ তাহার তীর্থত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। আমরা আমাদের এই সঙ্কল্পিত যাত্রার শেষে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; এইবার পূজাশেষে বিচার করিতে বসি। কেন না বিচার মানুষের ধর্ম্ম; অতি নিকৃষ্ট হইতে চরম অবস্থা পর্য্যন্ত ইহা তাহার সঙ্গের সাথী।

উত্তরবাহিনী ভাগিরথী ব্যতীত গঙ্গাযমুনা সঙ্গম তুল্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কিছু দক্ষিণেশ্বরে না থাকিলেও প্রকৃতির সত্যসুন্দর মূর্ত্তি এখানে রুদ্র কোমলের মিশ্রণে দেদীপ্যমানা। জাহ্নবীর চিরচঞ্চল লহরীলীলা উপকূলস্থ গম্ভীর নির্জ্জনতাকে এমন লাবণ্যমণ্ডিত করিয়াছে যে দর্শককে স্বভাবনির্ব্বিশেষে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। তদুপরি চারুপুষ্পোদ্যান ও নানাবিধ রসাল ফলের বাগান-বেষ্টিত মনোহর বিচিত্র মন্দির শ্রেণী ভক্তহৃদয়ে অপার্থিব ভাবের উদ্দীপন করিয়া থাকে। স্থানটী যে মনোরম, একথা অস্বীকার করিবার উপায় বোধ করি শত চেষ্টায়ও মিলে না। দ্বিতীয়তঃ এখানকার দেবায়-তনে যদিও অনাদিলিঙ্গ শিব কিংবা স্বয়মুত্থিতা শক্তি-মূর্ত্তি দেবালয়কে পূর্ব্ব পরিচিত পীঠস্থান সমূহের অন্যতম করে নাই সত্য, তথাপি যখনই স্মরণ হয় যে এই

দেবালয়েরই সুঠাম সুগঠিত ভবতারিণী মূর্ত্তি একদিন দর্শকমাত্রেরই নিকট চৈতন্যময়ী হইয়া সমগ্র দেবালয়-টীকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং নবরত্নমন্দিরে প্রবেশ করিতে সকলেরই তখন গা ছম ছম্ করিত তখনই হৃদয় মন শ্রদ্ধাবিশ্বাসে ভরপূর হইয়া উঠে। দেবালয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিদর্শন আর কি হইতে পারে? তদ্ভিন্ন শ্রীক্ষেত্র ও গঙ্গাসাগর যাত্রী নানাপন্থীর অনেকানেক সন্ন্যাসী তাপসগণ তৎকালে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে ধূনি জ্বালাইয়া প্রায়ই বাস করিতেন। একদল যাইতেছে, একদল আসিতেছে, এইরূপ নিত্য ঘটিত এমন কি সেই সাধু সমাগমের ক্ষীণ স্মৃতি আজও এক আধ দল জটাজূটধারী গৈরিক শোভিত কৌপীনবন্তের সর্ব্বদা উপস্থিতিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে পঞ্চবটীতে তোতাপুরীর ভৈরবদর্শনবৃত্তান্ত স্মরণ করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অধিকন্তু যোগেশ্বর প্রভৃতি দ্বাদশশিবলিঙ্গ এবং রাধাকান্ত ও শ্রীরাধা সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া মায়ের বাটীটিকে অধিকতর উদার ও মধুর করিয়াছেন।

তৎপরে এখানে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত এবং তাহার

বাণীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ত আমরা 'আচমনে' ও 'আবাহনে' পূর্ব্বাহ্নেই করিয়া রাখিয়াছি। এখানে যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য; তাহা সত্যের একদেশীয় দর্শন মাত্র নহে। সে সত্য এখানে একটী রক্তমাংসের মানব দেহের সচল জীবন ধারায় প্রকট হইয়াছিল। কেহ একা বা কয়েকজনে মিলিয়া তাহা সাড়ম্বরে প্রচার করে নাই। যে কয়জন মহাপুরুষ সেই সত্যে আপনাদের হারাইয়া ফেলিযাছিলেন উত্তরকালে তাঁহারাই বিশ্বের দরবারে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। ক্রমে আমরা উক্ত সত্যের আলোচনাভিমুখেই অগ্রসর হইতেছি।

অতঃপর তীর্থস্থনির্দ্দেশক মহাপুরুষের জীবনলীলা সম্বন্ধে আমরা দক্ষিণেশ্বরে এতটুকুও অভাব বোধ করি না। কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানভূমিতে যথারীতি প্রতিষ্ঠিত শক্তি সাধন বেদিকায় তোতাপুরী এবং ভৈরবী প্রভৃতির ন্যায় মহা মহা নারী পুরুষগণের আংশিক জীবনলীলা এস্থানকে ঋতময়, পুণ্যময়, শিবময় করিয়া দিয়াছে। এত করিয়াও জগদীশ্বর দক্ষিণেশ্বরকে তীর্থক্ষেত্র করিতে কোথাও বাকী রাখিলেন কি? এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ না ঘটিলে কি এই বস্তুতান্ত্রিকতার যুগ

পরাধীন ভারতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত বঙ্গ অঙ্গের এই জীর্ণ পল্লীর ধূলিকণাকে সুবর্ণ জ্ঞানে মাথায় করিয়া লইত?

এইবারে আমাদের এই যাত্রাভিনয়ের শেষ গান। যে জন্য দক্ষিণেশ্বর আজ সিদ্ধপীঠ এবং জাতির তীর্থ-সমূহের মধ্যমণি, সেই জীবন্ত মানবতার আমরা এখনও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। উপলব্ধি করা ত বড় কথা, বিচার বুদ্ধি সহায়ে গ্রহণ করিতেই এপর্য্যন্ত আমাদের বাকী আছে। জানি, আমাদের অপরিপক্ক চিন্তাশক্তি, অমার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তি, অপ্রচুর অভিজ্ঞতা এবং অপ্রকাশিত জ্ঞানের পক্ষে শেষোক্ত কার্য্যটী যথেষ্ট দুরূহ; তাহার উপর আছে আমাদের ভাষাজ্ঞানের অভাব ও তাহার সঙ্গে মনোভাব ব্যক্ত করিবার অক্ষমতা। তথাপি মানুষের পক্ষে তাহার চিন্তার প্রিয়তম ফলটী সাধারণ্যে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইবার বাসনার অসংযম স্বাভাবিক। তাই আমরা এমন দুঃসাহস করিতে ভীত হইতেছি না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দক্ষিণেশ্বর বাসকালীন জীবনযাত্রাই দক্ষিণেশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে পরমহংসদেবকে অবতার বা ঐরূপ কিছু প্রতিপন্ন করিতে আমরা চাহি না;

অথবা তাহা চাওয়াও আমাদের ক্ষুদ্র মতে অধুনা সুযুক্তি নহে। এমন কি তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া ছাড়িয়াও আমরা দিব না। তিনি ছিলেন একজন সত্যকার মানুষ অর্থাৎ মানুষ যাহা হইতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তু যেমন তাহাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বেই সত্য এবং আমরা তাহাদের সেই সত্যরূপ ভুলিয়া এই ক্ষণিক মায়ারূপেই মুগ্ধ থাকি, তেমনি এই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, সৌরজগৎসম্বলিত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্য আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে মানিয়া লইলে অসঙ্কোচে এবং দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মানুষের চরম অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। মানুষের মধ্যে কেহ হয়ত এই মায়াময়, ক্ষণিক, বিরোধসঙ্কুল জগৎকেই সত্য বলিয়া কায়মনপ্রাণে জানে; কেহ হয়ত আধ্যাত্মিক ভাবকেই সত্য বলিয়া জানে; কিন্তু তাহা ভাবে না। আবার আর কেহবা তাহা জানে এবং ভাবে; অপর কেহ হয়ত সেইরূপ অনুভব করিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। আবার আর একজন অনুভবও করে কিন্তু কার্য্যে তদনুযায়ী চলিতে চাহেনা। হয়ত বা কেহ সেইরূপ চলিতে চাহে কিন্তু পারে না; চেষ্টা

করে মাত্র। যিনি ভাগ্যবান পুরুষ তিনি উক্ত শেষ চেষ্টায়ও অকৃতকার্য্য হন না, এই প্রভেদ।,

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সর্ব্বশেষোক্ত ভাগ্যবান পুরুষ। মানুষের এই সহস্রমুখী অনৈক্যের মধ্যে তাঁহাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি সকল খণ্ড খণ্ড অবস্থার মধ্য দিয়া অখণ্ডে পৌঁছিয়াছেন; সকল সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমে মিশিয়াছেন। আবার তাঁহার একটী ধারাবাহিক পরিপূর্ণ জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র অংশগুলিও জাজ্বল্যমান। তিনি যাহা জানিয়াছেন তাহাই অনুভব করিয়াছেন, আবার তাহাই তিনি কার্য্যে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে চিন্তা, ইচ্ছা, চেষ্টা সব ছিল; কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতা ছিল; কোনটীরই ব্যতিক্রম ঘটে নাই বা কোন একটীই অপরগুলিকে গ্রাস বা ছোট করিয়া আপনি প্রবল হয় নাই। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা সত্য সত্য হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। তাঁহার জন্ম, দেহ মনের পরিণতি, পূর্ণ পরিণাম, পুনর্জ্জনন, জরা ও মৃত্যু সমস্তই সত্যে ওতঃপ্রোত। তাই বলিয়াছি তিনি একজন সত্যকার মানুষ।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে চরম মানুষ প্রতিপন্ন করিবার ছলে কাহাকেও যে আমরা ছোট করিতেছি,

এমন ভ্রান্ত ধারণা যেন কোন পাঠক পাঠিকার অন্তরে উদয় না হয়, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। কেননা, যে যাহার কালে ও দেশে এইরূপই চরম মানুষ; তাহাতে 'তুমি' 'আমি'ও বাদ পড়িনা। কারণ কে বলিবে—

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস?"

রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন লোকমান্য তিলকের পর মহাত্মা গান্ধী, সাহিত্য জগতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম্মজগতে তেমনি রাজা রামমোহনের পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানে আমরা "ধর্ম্মের" পরিপূর্ণ উদার অর্থেই কথাটি ব্যবহার করিতেছি; ইংরাজী "রিলিজনের" প্রতিশব্দরূপে নহে। উক্ত তিন ক্ষেত্রেই প্রথম জনের নিকট যাহা আদর্শ ছিল, দ্বিতীয় জনের নিকট তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, কল্পনা প্রাকৃত হইয়াছে। যাহা ধ্যেয় ছিল, তাহা আলিঙ্গনে ধরা দিয়াছে। অথবা প্রথম ব্যক্তির অন্তরে যাহা ছিল, দ্বিতীয়ের অন্তর বাহির তাহাতেই ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রথমের ব্যবহারিক ও সত্য সত্ত্বা দ্বিতীয়ের আধ্যাত্মিক সত্ত্বায় লীন হইয়া গিয়াছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে একটী অখণ্ড জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু সেই জীবনের দৃষ্টান্ত ধর্ম্মজগতে যে অভিনব দর্শনশাস্ত্রের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়াছে তাহাতে জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মান্বেষী ব্যক্তির হৃদয়ে বিশিষ্ট শিক্ষার নব নব প্রেরণা জাগাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও যে জাগাইবে তাহা নিঃসঙ্কোচে অনুমান করা যায়। সেই সত্ত্বরজঃতমঃ ত্রিগুণাতীত জীবনে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির যে ত্রিবেণী সঙ্গম জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই মহামানবতা বিশ্বময় আপনার পরিধি বিস্তার করিতেছে। কবে যে সেই ভাগবতলীলার এই পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্য অভিনীত হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে প্রতিফলিত দর্শনশাস্ত্রের সম্যক আলোচনা করিবার সাধ্য বা দুঃসাহস আমাদের নাই; তবে আমরা তাহার অসংখ্যরূপের কোন রূপটীই দর্শন করিয়া আমাদের নয়ন সার্থক করিতে পারি কিনা, চেষ্টা দেখিব মাত্র।

সেই মহাজীবনের আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি; বলিয়াছি যে দক্ষিণেশ্বর শ্রীমদ্ভাগবত গীতার জীবন্তস্বরূপ,

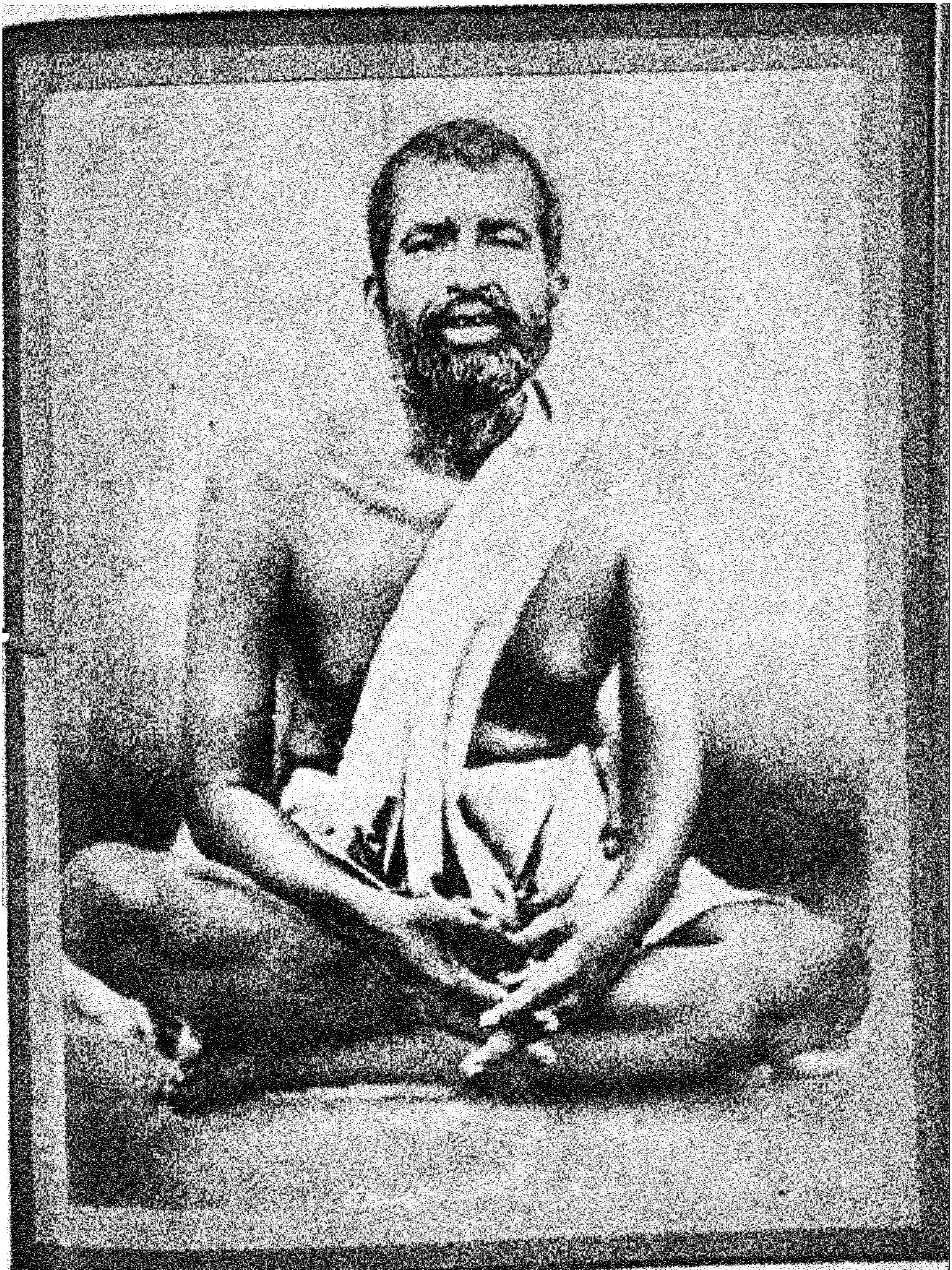

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

অথবা বেদান্তের রক্তমাংসের সংস্করণ জগতকে উপহার দিয়া ধন্য হইয়াছে। পারিবারিক—সামাজিক—রাষ্ট্রীক—আর্থিক—ঐতিহাসিক—বৈজ্ঞানিক—দার্শনিক সকল সমস্যার সমাধান ঐ নিরক্ষর ব্রাহ্মণটীর জীবনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যখন এই ভাবগত জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম সময়াংশের নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রকাশ হওয়া সম্ভব হইবে, তখনই আমাদের এই উক্তি প্রমাণ সাপেক্ষ হইবে। এখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনার মহান মর্য্যাদাশীল সিদ্ধান্ত সবিনয়ে প্রকাশ করিতেছি মাত্র।

এখন সেই ঋতময় জীবনের দক্ষিণেশ্বর যুগই প্রথমতঃ আমাদের আলোচ্য ; তাহাও আমাদের অসিদ্ধ বুদ্ধিবিবেচনার অপূর্ণতা দোষে দুষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। তথাপি উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপরিহার্য্য।

দক্ষিণেশ্বরের ভাবী পূজারী গদাধর শরীর মনের যে অটুট বল লইয়া প্রথম দেখা দিলেন, তাহাতে অধিকারী বিচারের কেমন সহজ মীমাংসা হইয়া গেল, আশা করি তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বিস্মৃত হন নাই। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। বলবানের স্বাধীন ইচ্ছা সর্ব্বপ্রকার লাভজনক প্রচেষ্টার মূলাধার।

দীর্ঘ রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রবল প্রভাবে বংশ-পরম্পরানুক্রমে ব্যক্তিগত অভ্যাসও সংস্কারনিচয় সেই ইচ্ছাকে পদে পদে খর্ব্ব করিয়া অধিকারীকে নির্ব্বীর্য্য করিতেছে; বিশেষ করিয়া অর্থানুরক্তি বিষয়িণী বর্ত্ত-মানের শিক্ষার মধ্যদিয়া আমাদের এই নৈতিক তথা সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি ঘটিয়াছে। এমন শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে ত্যজ্য। বাহিরের স্বাধীনতাই যে ভূমিকে উর্ব্বর করিবে; নতুবা ভিতরের ব্যক্তিগত স্বরাজ্যের বীজ অঙ্কুরিত হইবে কোথায়? তাই নিরক্ষর ব্রাহ্মণকুমার জগজ্জননীর পূজারী হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। তারপরেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের শৃঙ্খলাকারিণী গীতার "স্বধর্ম্ম" নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি, জ্যেষ্ঠের শত অনুরোধেও ৺কালীবাড়ীর প্রসাদ গ্রহণে গদাধরের অপারগতায়। "স্বধর্ম্ম" বলিতে যে জন্মগত সংস্কার বুঝায় তাহাকে মানুষ কিরূপ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আঁকড়াইয়া ধরিবে আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? তাহা বলবানকে হয়ত একটু ঘুরাইল কিন্তু বলবৃদ্ধিও করিল যে। ইহার পরেই আবার বৃহত্তর "স্বধর্ম্মের" আলোতে ক্ষুদ্র "স্বধর্ম্ম" কোথায় মিলাইয়া গেল আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। সংস্কার মোহমুক্ত শান্ত হৃদয়গগন প্রাণভরা মধুর "মা"

"মা" ডাকে পরিপূর্ণ হইয়া সৎ-চিৎ-আনন্দালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।"

সেই জ্যোতিঃসমুদ্রে মানবজীবনের নিত্যসম্বল তিনটী নীলপদ্ম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া ভাসিতে লাগিল—ব্রহ্মচর্য্য, সত্যরক্ষা ও নামগানের মাহাত্ম্য। মানবজীবনের অবলম্বনীয় পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ।" সর্ব্বপ্রকার স্ববিরোধী দ্বিভাব সমূহের মধ্যে পথ ধরিয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হইবে; কোনটীকে ত্যাগ করিলে চলিবে না কিংবা কোনটীতে মজিলে হইবে না। রামেন্দ্র সুন্দর যথার্থই বলিয়াছেন যে মানুষের তুল্য হতভাগ্য জীব আর নাই। স্বাধীন বলবান মানবাত্মা তথা ব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত সমগ্র বিশ্বজগৎ কেমন করিয়া "স্বধর্ম্ম" আচরণের ক্ষুরধার পন্থায় বিধি নিষেধের সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবে বা হইতেছে—বিজ্ঞান সম্মত সেই আসল বিবর্ত্তনবাদও এইখানে চিত্রিত হইয়াছে।

এইবারে অর্থনৈতিক সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। কল্পিত অভাবরাক্ষস তাহার সহস্র মুখ ব্যাদান করিয়া আপন আহার্য্য অন্বেষণে যখন মানুষকে অপরের

মুখের গ্রাস হরণ করাইতে ব্যস্ত করিবে স্থির করিতেছে, তখন সেই মানুষ তাহার মুষ্টিস্থিত "টাকা" ও "মাটী" একত্রে রাক্ষসের মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। তবে দরিদ্র দেশের অর্থাভাব ত সমস্যা নহে; সে যে মৃত্যু। তাই তিনি অর্থের দাস না হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিলেন। দাসত্বের কারণ স্বরূপ দেব-দেবীর অলঙ্কার সমূহের দায়িত্ব গ্রহণ অথবা স্বোপার্জ্জিত অর্থ প্রাপ্যজ্ঞানে গ্রহণ বা সঞ্চয় করিতে পারিলেন না; বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিলেন মাত্র। পক্ষান্তরে ভারতীয় আদর্শে দাতার দানে কেমন করিয়া ধনী দরিদ্র বিরোধের অবসান সম্ভব, তাহাও তাঁহারই জীবনে সুপ্রকাশ।

সেই ঊর্দ্ধমূল অধঃ শাখঃ অশ্বত্থতরুটীর যে শাখাগুলি পারিবারিক জীবনে বিস্তার লাভ করিয়াছিল সেগুলিও নিস্তেজ কিংবা শুষ্ক ছিলনা; তবে তাহারা সর্ব্বদাই সেই "ঊর্দ্ধমূল" হইতে রস সংগ্রহ করিয়াছে বটে। মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নী, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী মানস সন্তানগণ—কাহাকেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী জ্ঞানে দূর বা ভিন্ন মনে করিতে হয় নাই। তাঁহার বিবাহ এবং পতির কর্ত্তব্যপালন, তাঁহার পুত্রত্ব—এককথায় তাঁহার সকল পারিবারিক কর্ত্তব্যই নিখুঁৎ

এবং সম্পূর্ণ। তাঁহাকে বিবাহে যে পণ দিয়া কন্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এই ঘটনাটি যেন আধুনিক পণ প্রথার অগৌরবকেই পরিস্ফুট করিয়া দেয়; যেমন তাঁহার নিরক্ষরতা আধুনিক বিদ্যার দর্পকে চূর্ণ করে। তদ্ভিন্ন তাঁহার বিবাহে উৎসাহ এবং পাত্রী অন্বেষণে সাহায্যকে সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে হয় না; ইহাদ্বারা বিবাহকাল নির্ণয় সমস্যার যেন সুন্দর সমাধান সাধিত হইয়াছে যে, বাল্যের কৌতূহলান্তে পরিণত বয়সের বিবাহে ইচ্ছাই বিবাহকাল নিরুপণ করিয়া দিবে। তবে পাশ্চাত্য আদর্শে শ্রদ্ধাবান কেহ কথা তুলিতে পারেন যে রামকৃষ্ণ দেবের ঔরস সন্তান না জন্মানতে তাঁহার মানবত্বের লাঘব হইয়াছে। ইহার উত্তরে আশাকরি, কোন ভারতবাসীকেই আমাদের বুঝাইতে হইবে না যে মানস সন্তানেই মানুষের যথার্থ পিতৃত্ব সূচিত হয়; ঔরস সন্তান বরং পশুধর্ম্মের অবশেষ। যে মানুষ অসম্পূর্ণ সেই আপনাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া ঔরসপুত্রকে আম-মোক্তার নামা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; আর যে স্বয়ং সম্পূর্ণ তাহার ত আর কাহাকেও কোন ভার বা দায়ীত্ব দিবার প্রয়োজন হয় না। তাই রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দ, রাখাল মহারাজ, সাধু নাগমহাশয়, রামদত্ত প্রমুখ

মানসসন্তানগণকে আপন ভাব সম্পদের উত্তরাধিকারী-রূপে রাখিয়া গিয়াছেন।

এই অমূল্য জীবনে আত্মচৈতন্যের উপর সমাজ প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—সর্ব্বভূতে শ্রীভগবান্‌কে প্রেমের চক্ষে দর্শন করিতে হইবে। তিনিই বলিতেছেন "অহং বৈশ্বা নরো ভূত্বা প্রাণীনাং দেহ মাশ্রিতঃ।" বহুর মধ্যে একত্ব—বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া দেশকাল পাত্রভেদে সামাজিক রীতিনীতি, বিধিনিষেধ অপালনীয় নহে ; তবে মানুষের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈরাগী বিবেকবুদ্ধিই তাহার উপযুক্ত পরিচালক। রামকৃষ্ণদেব একসময়ে রাণী রাসমণির কালীবাটীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; আবার তৎ পূর্ব্বে জিদ করিয়াই তিনি শূদ্রাণীকে ভিক্ষামাতারূপে বরণ করিয়াছেন। এইরূপে সামাজিক চতুর্ব্বর্ণের নিগূঢ় তত্ত্ব যে "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" তাহা তাঁহাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ন্যাসী, গৃহী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চারি আশ্রমের সমাজ দেহস্থিত প্রকৃত অবস্থান তাঁহার জীবনের অমোঘ বাণীতেই ব্যক্ত হইয়াছে। সমাজ শরীরের দুষ্টব্রণসদৃশ কপটতার, পশুত্বের ও অন্যের

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শাস্তিদানে যেমন তিনি বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন, সমাজ কল্যাণকর আদর্শ বিজ্ঞাননিষ্ঠা, নির্ভিক আত্মপ্রত্যয় ও সরল নির্ভরতা প্রভৃতির পুরস্কার প্রদানেও তাঁহাকে সেইরূপই মুক্তহস্ত দেখিতে পাই। বৃহত্তর সমাজেও হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীশ্চান প্রভৃতির যথাযথ স্থানে স্ব স্ব প্রভাব, প্রাধান্য ও অভ্রান্ততা তাঁহার চিহ্নিত জীবনেই সপ্রমাণ হইয়াছে; স্বধর্ম্মের প্রেরণায় যথার্থ সংস্কারকও অমর্য্যাদা লাভ করে নাই। নারীপুরুষও এই জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল।

ঐতিহাসিক সমস্যার ও তাহার সমাধানের আভাষ আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। মনুষ্য জীবনের যে চরম পরিণতি এই জগতের ইতিহাসে নানাবর্ণে, গন্ধে ও ছন্দে প্রস্ফুটিত হইতেছে সেই অব্যক্তই যেন এইখানে ব্যক্ত হইয়াছিল—

> "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
> অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্রকা পরিবেদনা।"

শ্রীভগবান এই জীবনটীর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যেন বিশ্বকে ডাকিয়া বলিতেছেন—

"নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব নভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥"

কত আবর্ত্তন বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের অন্তর দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণে দেবজন্ম লাভ করিয়া আবার বিবেকানন্দ প্রমুখ সোপান পথে উত্তর কালের বিশ্বদেহে মিলাইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান জগতের অতি বড় দুরূহ শিক্ষা সমস্যাও এই মহাজীবনে মীমাংসিত হইয়াছে। অতীত ভারতের সেই বেদপ্রসিদ্ধ গুরুমুখী সহজ সরল শিক্ষাপ্রণালী আধুনিক জগতের লক্ষ্যবহুল জটিল জীবনে ত আর সম্ভব নহে; তাই এখানে দেখিতে পাই যে মুক্ত আনন্দের ভূমিতে সঙ্গীতাদি সুকুমার কলার মহাসন পাতিয়া বালক শিক্ষার্থী আপনার পথে আত্মস্থ হইতে যাইতেছেন।

হিন্দুর তথাকথিত "পুতুল পূজা" ও বলিদান প্রশ্নেরও এই বিরাট জীবনেই সদুত্তর মিলে। ধর্ম্মাচরণ সবখানি দিয়া করিতে হয়; কেবলমাত্র বুদ্ধি বা বিচার প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে পৃথকভাবে থাকিতে পারেনা; অনুভূতি ও বাসনাও যে বুদ্ধির সহিত ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়িত। প্রিয়তম মূর্ত্তিটীকে চিণ্ময়ীভাবে গ্রহণ না করিলে

দেহবুদ্ধির অঙ্কুশমাত্র থাকিতে মানুষের ধর্ম্মাচরণ যে অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ধর্ম্মাচরণের বিশিষ্ট পন্থায় অনধিকার থাকা মানুষের সম্ভব; কিন্তু ধর্ম্মাচরণ যে মানুষের জীবন; ধর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার। উগ্রভাবাপন্ন, রক্তলোলুপ বীরের বলিদান প্রবৃত্তিকে কোনক্রমে দাবাইয়া রাখিলে যে মানবতার সেই মহান অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। তাই বলিয়া ধর্ম্মান্ধের আন্তরিকতা-শূন্য পুতুলপূজা বা কালীঘাটের বলিপ্রদত্ত পশুর ব্যবসায় কখনও ধর্ম্ম হইতে পারে না। সেইজন্যই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনও দেখি ৺ভবতারিণীর পূজানিরত কখনও আবার ভাবসমাধিমগ্ন; একসময়ে দেখি ৺চণ্ডিকাদেবীর উদ্দীপনায় গলিত আমমাংসও ভাবাবস্থায় জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিতেছেন, আবার দেখি প্রেমময় ঠাকুর অহিংসব্রতধারী নিরামিষাশী।

সর্ব্বশেষে আমরা দেখিতে পাই যে এই দেবজীবনে প্রতিফলিত দর্শন শাস্ত্র এক অভিনব সামগ্রী। তাহাতে কোন প্রচলিত দার্শনিক মতের খণ্ডনও নাই কিংবা একান্ত সমর্থনও নাই, মত যে পথ মাত্র। সেই সকল পথ বাহিয়া যেখানে যাইতে হইবে সেই অনুচ্ছিষ্ট 'তৎ'ই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং মম॥"

নিখুঁৎ দেহমনে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত ও নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ফলকামী না হইয়া মন মুখ ও কাজ এক করিয়া সত্য সরলতা ও বিবেক বৈরাগ্যের চাষ দিতে থাকিলে কালে সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধুর কৃপা বর্ষণ হইলে ফসল ফলিবে। এক কথায় ইহাই মনুষ্যজীবন; তাই গীতা বলিতেছেন—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।" ইহা মানুষের কর্ত্তব্য বলিলে আমরা ভুল বুঝি; মনে করি ইহা করা না করা মানুষের হাতে; তদপেক্ষা ইহাই মানুষের সত্যকার জীবন বলাই শ্রেয়ঃ। উক্ত কৃপা আপনি বর্ষিত হয়। যাহারা ধরিতে বা বুঝিতে পারে না তাহারা অমানুষ; আর যাহারা তাহা উপলব্ধি করে তাহারাই "মান-হুঁস"—মানুষ। এই কৃপাই সেই পরমধাম লাভের মূলাধার; "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

এখন আমরা আমাদের এই দর্শনের দর্শনীয় বস্তুর পরিচয় দিয়া জগতের দার্শনিক সমস্যার সাধ্যমত সন্ধান লইব। প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে দার্শনিক চিন্তার উৎসমূল

কোথায় ? পাশ্চাত্য দর্শনের ঐতিহাসিকগণের মতে নিঃস্বার্থ জ্ঞান পিপাসাই মানবমনে অধ্যাত্মচিন্তার প্রথম উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য দার্শনিকগণ "অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির" বাসনা হইতেই দর্শনের সূচনা ধরিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে এই মতভেদের আমরা সুন্দর বিচার পাই তখন, যখন স্নেহশীল পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহাকে সাধন সমরে অধিকতর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা লইয়া নামিতে দেখি। নিষ্কাম জ্ঞানপিপাসা অপেক্ষা "অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির" বাসনা যে মনোভূমির আদিমতর স্তরের বস্তু তাহার এমন জাজ্বল্যমান প্রমাণ মনোবিজ্ঞানেও বোধকরি দুষ্প্রাপ্য।

তারপরে এই জীবনদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়, এই জীবনে সম্ভবপর সকল প্রকার রূপেই পূর্ণবিকশিত হইয়াছে। এই বৈদিক "তৎ"ই যে গীতার "আত্মা", বেদান্তের "ব্রহ্ম," তন্ত্রের "শিবশক্তি", ভাগবতের "রাধাকৃষ্ণ," বাইবেলের "গড" (God), ও কোরাণের "আল্লাহ" তাহা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, যোগ, বেদান্ত,—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর,—রামাৎ, ইস্‌লাম, খ্রীষ্টান

প্রভৃতি সকলপ্রকার সাধনায় সিদ্ধ জীবন দেখাইয়া দিয়াছে যে "যত মত তত পথ"। এই প্রসঙ্গে পল্লবগ্রাহী ভাবুকগণের মধ্যে কথা উঠিতে শুনিয়াছি যে একটীর পর একটী ধরিয়া এত প্রকারের সাধন করায় রামকৃষ্ণদেবের বিশেষত্ব খর্ব্ব হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি ইহাতেই তাঁহার মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ হইয়াছে; অন্যান্য সিদ্ধ পুরুষ একটী সাধনায় সিদ্ধ হইয়াই হুঁস হারাইয়া ফেলেন আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব? তাঁহার নিরক্ষরতা ও তাঁহার বিচিত্র বিবাহব্যাপার ও সংসারধর্ম্মাচরণের ন্যায় তাঁহার এই সাধন বাহুল্যও এই গণতান্ত্রিক যুগের অপৌরষেয় বেদবিধান। যে যাহার দেশকালপাত্রে যে সত্যপ্রতিষ্ঠ। অনধিকার সমালোচনায় জাগতিক শৃঙ্খলার বাহ্যিক বিপর্য্যয়ে যে সমালোচকেরই সমূহ ক্ষতি। সত্য অনবদ্যই থাকিয়া যায়; জ্ঞানাধিষ্ঠিত প্রেমপূর্ণ ব্যবহারই যে মহামানবের যথার্থ স্বভাব, তাহা এই অমোঘ জীবন বিশ্বকে অপরোক্ষভাবেই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছে। "হাঁজী হাঁজী করতা রহ ভাই বইঠিয়ে আপন ঠাম।"

তবে উক্ত "আপন ঠাম" বা গীতার স্বধর্ম্ম আবিষ্কার করাই মানবজীবনের আসল সমস্যা। সে সমস্যারও

সমাধান এখানে নিখুঁৎ দেহমনে অন্তর বাহিরের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে; অন্তর অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইলেই স্বধর্ম্ম আপনি ফুটিয়া উঠিবে; তখন আর কোন কথাই থাকিবে না। এইখানে দৈবপুরুষকার মতবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহারও সুসঙ্গত মীমাংসা এই অতুলনীয় জীবনকাব্যের প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান। যাহার নাম পুরুষকার তাহার নামই দৈব। তুমি করাইতেছ আর আমি করিতেছি একই কথা; তাহা হইলেই ভোগ অনাসক্ত হইয়া গেল; সকল জ্বালা জুড়াইল। "সোহং" বা "তত্ত্বমসি" তত্ত্ব

"ত্বংস্বধা, ত্বংস্বাহা ত্বংহি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যা ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥"

হইয়া গেল।

এখন রহিল তবু এই তুমি আমির প্রত্যক্ষ ব্যবধান। আমি সত্য তুমি "সত্যস্যসত্যং", আমির মধ্যে বিশ্বজগৎ; অথবা তুমি সত্য আমি "সত্যস্যসত্যং", তুমির মধ্যে ক্ষুদ্র আমি। এককথায় রহিল "পাকা আমি" আর "কাঁচা আমির" ব্যবধান। এই ব্যবধান পূরণ করিতেছেন সৃষ্টিকারিণী জননী মায়া; তাঁহার দুইরূপ, বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া, পাকা আমির নিকটে যিনি

তিনি বিদ্যা, দূরে যিনি তিনি অবিদ্যা। পাকা আমি কাঁচা আমির মধ্যে, অথবা তুমি আমির মধ্যে আপনার কর্ম্মফলে আপনি বদ্ধ হইয়া মায়ার অধীনে লীলা করিতেছেন। এই মায়া, লীলা ও কর্ম্মফল উক্ত বর্ণিত পরম রহস্যের চরম স্বীকার সঙ্কেত মাত্র; ইহাদের স্বরূপ কি তাহা উক্ত সঙ্কেতত্রয়ে নির্ণীত হয় না; এখান হইতে উহা অদৃশ্য। যেখান হইতে উহা দৃশ্য, সেখানকার কথাও কেহ ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। তবে সেখানে পৌঁছিবার উপায় সাধনা ও সেখানকার কৃপায় সিদ্ধি; তাই "ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।" ঠাকুরের জীবনে আরও দেখিয়াছি যে উক্ত গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইবার যে সাধনযান—তাহার সারথি যেমনি কৃপাময়ের কৃপা, তাহার অশ্বও তেমনি বিশ্বাস, সে বিশ্বাসেরও উৎসমূল সেই কৃপা। অশ্ব জীবন্ত হওয়া চাইত! অবিদ্যমায়ার উপর বিদ্যামায়ার প্রতিক্রিয়ার 'অমোঘ শক্তিতে মানুষের অন্তর্নিহিত সন্দেহ একমাত্র ঐ বিশ্বাসেই নিরাকৃত হয়; কেননা আমাদের গন্তব্যস্থান যখন বিদ্যাঅবিদ্যাতীত; কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করিয়া যখন দুইটী কাঁটাই ফেলিয়া দিতে হয়; তখন বিশ্বাস ভিন্ন কে আমাদিগকে বলিয়া

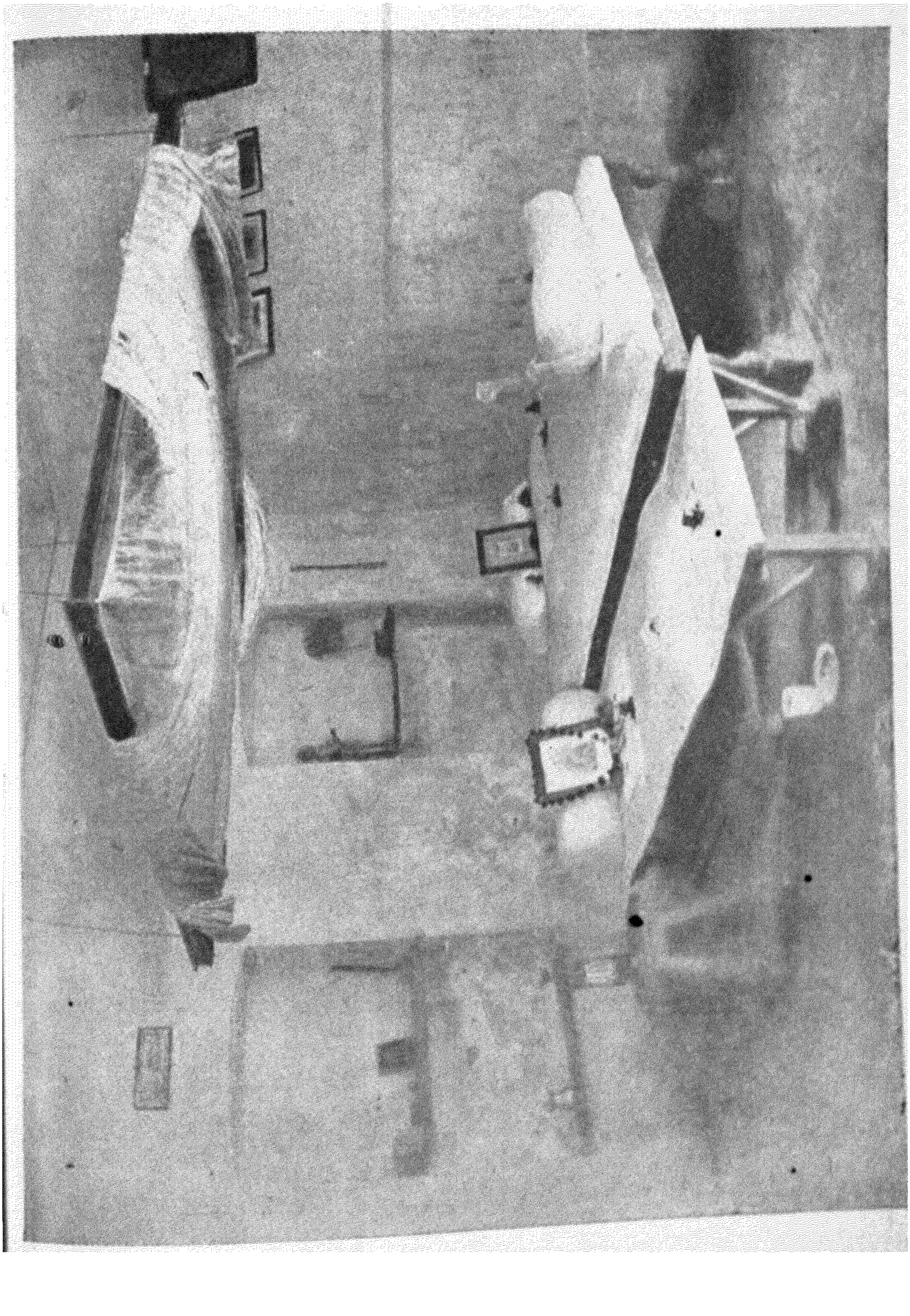

দিবে যে বিদ্যামায়াই অস্ত্র এবং অবিদ্যামায়াই ব্যাথা, উহার বিপরীত নহে। এমন যে বিশ্বাস অশ্ব তাহা আমাদের জীবনরথের সম্মুখে প্রাণময় থাকিবে সেই কৃপারূপ প্রাণের জোরে।

আরও সহস্র সহস্র সমস্যার সমাধানরূপ রত্ন এই জীবন রত্নাকরে রহিয়াছে, আমরা শৈবালদল যাহা লক্ষ্যে আসিল দেখিলাম মাত্র। তবে আশা আছে সনাতন সমুদ্র মন্থনে রত্নরাজি চিরদিন গোপন থাকিবে না। এই শাশ্বত জীবনকথা মনে উদয় হইলেই কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে ইচ্ছা করে—

"এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে
হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে
নমি নর দেবতারে।"

মার্জ্জন মন্ত্র।

যাঁহার পূজা তিনিই শেষ করাইলেন এখন তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া মার্জ্জন মন্ত্র পাঠে আত্মনিবেদন করিতে চাই।

প্রথম পাঠ।—পাঠকপাঠিকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য রাণী রাসমণির একটী বংশ তালিকা আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

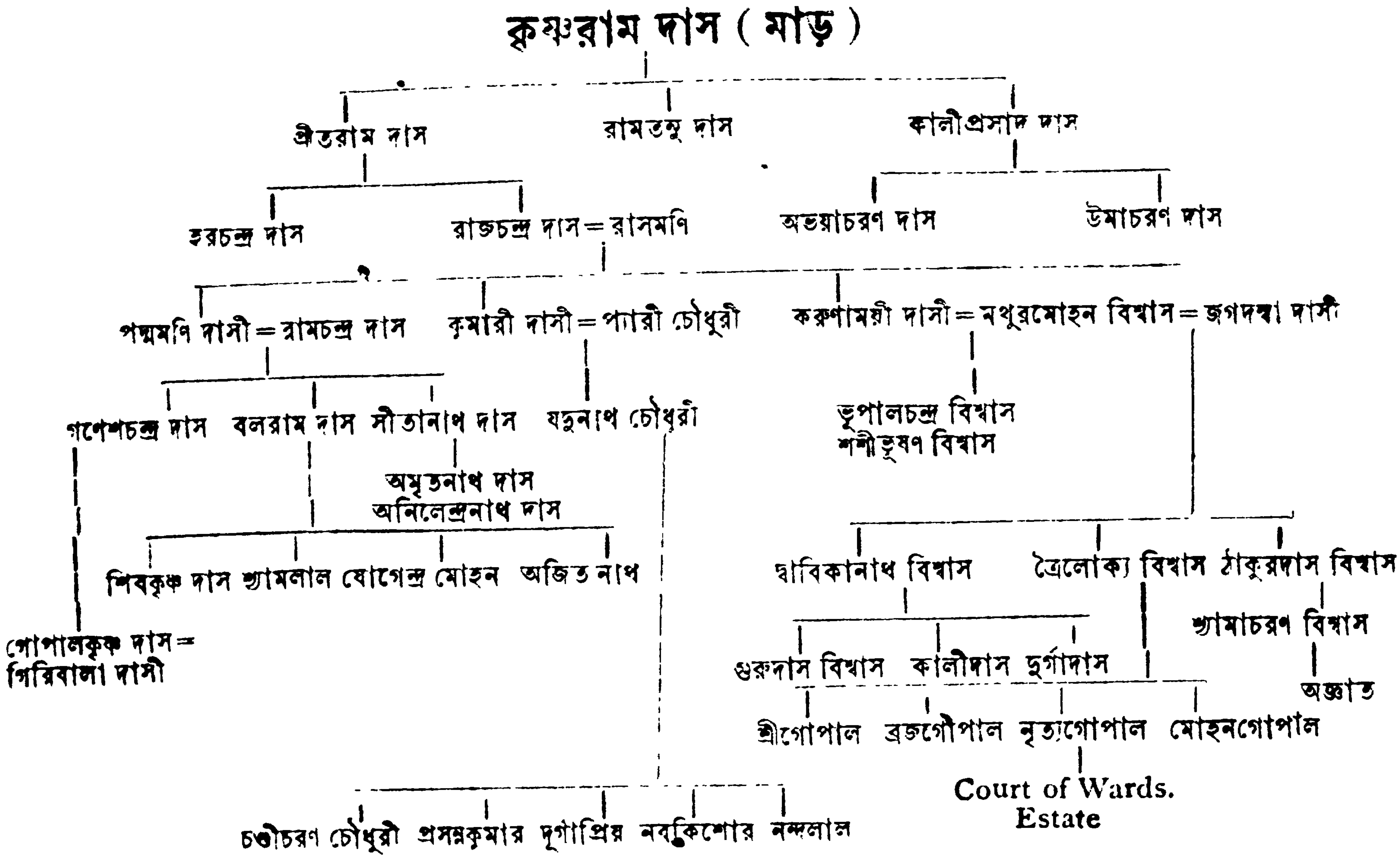
কৃষ্ণরাম দাস (মাড়)
প্রীতরাম দাস
রামতনু দাস
কালীপ্রসাদ দাস
হরচন্দ্র দাস
রাজচন্দ্র দাস = রাসমণি
অভয়াচরণ দাস
উমাচরণ দাস
পদ্মমণি দাসী = রামচন্দ্র দাস
কুমারী দাসী = প্যারী চৌধুরী
করুণাময়ী দাসী = মথুরমোহন বিশ্বাস = জগদম্বা দাসী
গণেশচন্দ্র দাস
বলরাম দাস
সীতানাথ দাস
যদুনাথ চৌধুরী
ভূপালচন্দ্র বিশ্বাস
শশীভূষণ বিশ্বাস
অমৃতনাথ দাস
অনিলেন্দ্রনাথ দাস
শিবকৃষ্ণ দাস
শ্যামলাল
যোগেন্দ্র মোহন
অজিত নাথ
দ্বারিকানাথ বিশ্বাস
ত্রৈলোক্য বিশ্বাস
ঠাকুরদাস বিশ্বাস
গোপালকৃষ্ণ দাস =
গিরিবালা দাসী
গুরুদাস বিশ্বাস
কালীদাস
দুর্গাদাস
শ্যামাচরণ বিশ্বাস
অজ্ঞাত
শ্রীগোপাল
ব্রজগোপাল
নৃত্যগোপাল
মোহনগোপাল
Court of Wards.
Estate
চণ্ডীচরণ চৌধুরী
প্রসন্নকুমার
দুর্গাপ্রিয়
নবকিশোর
নন্দলাল

দ্বিতীয় পাঠ।—দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী হইতে ষ্টীমারঘাট ও দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাইবার যে পথ ওখানকার বেলতলা হইতে পূর্ব্বমুখে যাইলে পাওয়া যায়, সেই পথ ধরিয়া কিয়ৎদূর যাইলে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় (রামলালদাদা) মহাশয়ের বসতবাটী পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে রামলাল দাদার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ৺ভবতারিণীর পূজক এবং তাঁহার খুল্লতাত বা রামলাল দাদার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায়ও মধ্যে মধ্যে পালা করিয়া ৺মায়ের পূজা করিয়া থাকেন।

আমরা সকলের অবগতির জন্য ঠাকুরের বংশ তালিকা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, এখানে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।—

মাণিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

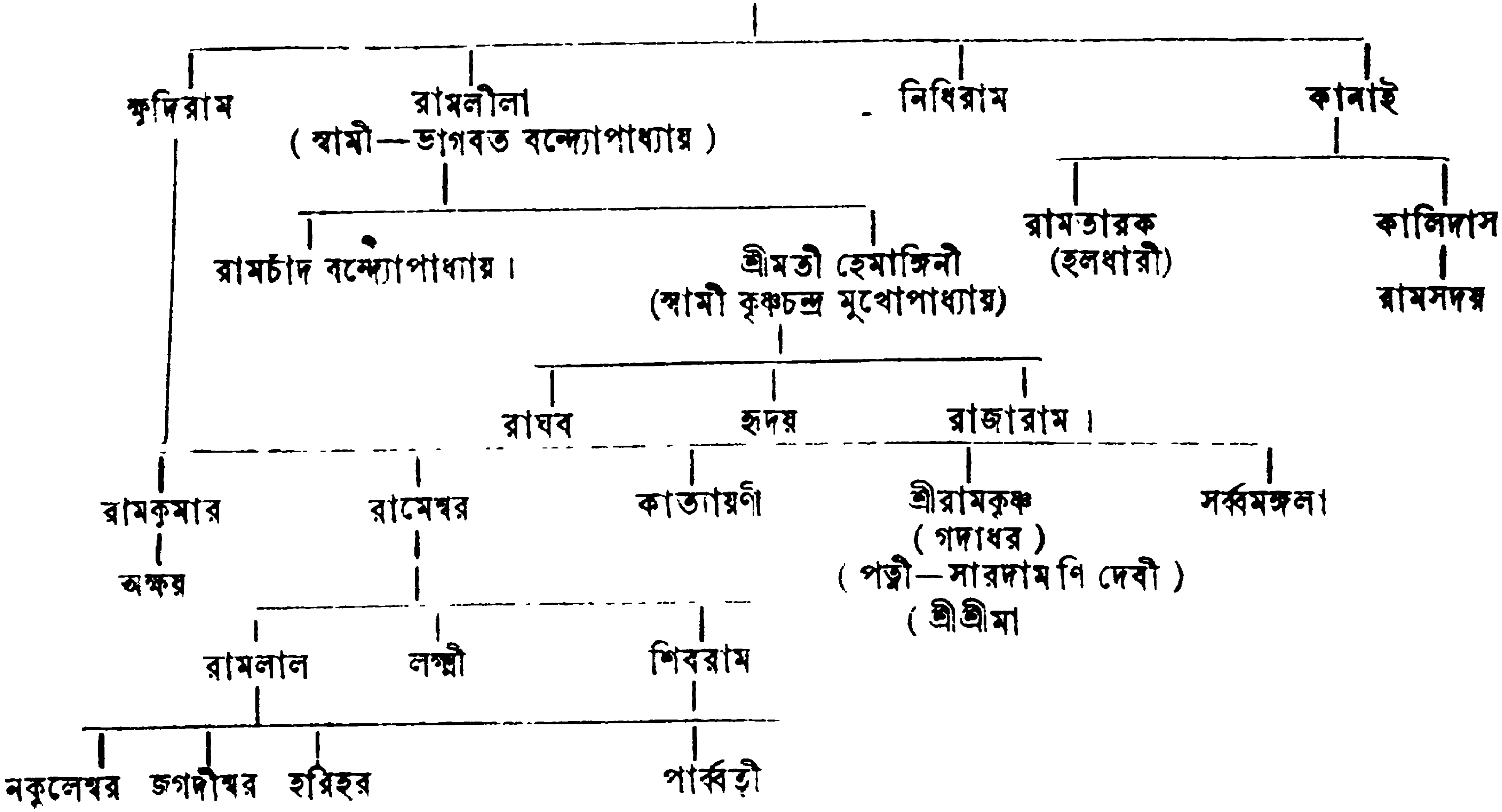

বিসর্জ্জন।

বেদান্তের ভূমি এই আর্য্যাবর্ত্তে বা হিন্দুস্থানে আধুনিক ভারতবর্ষে আবাহনের পর বিসর্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—কাজেই এই 'এক' আপনাতে দ্বিত্ব আরোপ করিতে পারিলেও স্বকৃত 'দ্বিতীয়কে' আপনার মধ্যে সংহৃত না করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। তাই আমাদের বিসর্জ্জনের আয়োজন।

বৃহত্তর দক্ষিণেশ্বর

রাণী রাসমণির ক্ষুদ্র দক্ষিণেশ্বর আর সে ক্ষুদ্রটী নাই এখন সে বৃহত্তর হইয়াছে। এই ক্রম বর্দ্ধনের পরিণতি যে কোথায় কবে এবং কিরূপ তাহা এক ভবিষ্যৎ মাত্রই বলিতে পারে। তবে আমরা ইহার সূচনা এবং এ পর্য্যন্ত তাহার যে নূতন রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই অতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব। এই আর এক হিসাবেও দক্ষিণেশ্বর সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

এই বৃহত্তর দক্ষিণেশ্বরের সূচনা আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে। তিনিই এখানকার ভাবে নবীন বাংলাকে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াস

পাইয়াছেন তাঁহার শেষ জীবনে আমরা লক্ষ্য করি। যে ব্রাহ্মসমাজ আদর্শচ্যুত অবনত তদানীন্তন হিন্দু সমাজের প্রতিবাদেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহাই ধীরে ধীরে সমন্বয়ের পথে পদক্ষেপ করিতে লাগিল। 'নববিধান' শ্রীভগবান্‌কে 'মা' বলিয়া ডাকিল, নারী পুরুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিল এবং কীর্ত্তনানন্দে মাতামাতি সুরু করিল।

তাহার পরে আসিলেন 'চির উন্নতশিরে' ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিশ্বের; বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হইলেন! ভারত বিবেকানন্দ সহায়ে সার্ব্বজনীন রামকৃষ্ণকে চিনিল। স্বামীজীর অগ্নিময় জীবনে অরূপ দক্ষিণেশ্বর বিরাট রূপ ধারণ করিল। সে রূপের কাঠাম প্রস্তুত হইয়াছিল বরাহনগর মঠে, গঠন হইল ভারতের পক্ষ হইতে মাদ্রাজে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে এবং প্রাচ্যের ভগ্নস্তূপে; পরে রং ফলান ও চালচিত্রাঙ্কন হইল বেলুড় মঠ প্রমুখ ভারত ও পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে। ঠাকুরের যে সকল ভক্তগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামীজীকে তাঁহার এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া-

ছিলেন ও করিতেছেন তাঁহাদের সহিত এখানে একটু পরিচয় করিয়া লই :—

নরেন্দ্রনাথ দত্ত	স্বামী বিবেকানন্দ।
রাখালচন্দ্র ঘোষ	স্বামী ব্রহ্মানন্দ।
যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	স্বামী যোগানন্দ।
বাবুরাম্ ঘোষ	স্বামী প্রেমানন্দ।
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	স্বামী সারদানন্দ।
শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।
গোপাল মণ্ডল	স্বামী অদ্বিতানন্দ।
তারকনাথ ঘোষাল	স্বামী শিবানন্দ।
নিরঞ্জন ঘোষ	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।
রাজুরাম (লাটু)	স্বামী অদ্ভুতানন্দ।
কালিদাস চন্দ্র	স্বামী অভেদানন্দ।
হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়	স্বামী তুরীয়ানন্দ।

স্বামীজী চিকাগো সহরে সর্ব্বধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহা সভায় বজ্রস্বরে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই যুদ্ধাভিযানের জন্য তিনি বেলুড় ও অন্যান্য প্রদেশে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়া গেলেন। যুদ্ধ আজও চলিয়াছে আর জগৎ তাহার জয়যুক্ত অবসানের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে।

এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্ত ব্যতিরেকে গৃহী ভক্তগণের উপদেশ, আদর্শ ও চরিত্র মাধুর্য্যের মধ্য দিয়াও দক্ষিণেশ্বর উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে। এই উভয় ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি যোগরক্ষা করিতেছেন সুপণ্ডিত অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার মহাশয়। সেই সৌম্য শান্ত শুভ্রমূর্ত্তি কখন বেলুড় মঠে কখন স্বগৃহে ঠাকুরের অমর স্মৃতি আপন অন্তর-সিংহাসনে বসাইয়া সতর্ক বিনয়ের সহিত বহন করিতেছেন। গৃহী ভক্তগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়জন চিরস্মরণীয়।—

মথুরমোহন বিশ্বাস।	তারকনাথ মুখোপাধ্যায়।
কর্ণেল বিশ্বানন্দ উপাধ্যায়।	বলরাম বসু।
কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল।	অধরচন্দ্র সেন।
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।	দুর্গাচরণ নাগ (সাধু নাগমহাশয়)।
রামচন্দ্র দত্ত।	
ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়।	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টারমহাশয়)।

গৃহী ভক্তগণের মধ্যে চিন্তাশীল ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত। বরাহনগরে ঠাকুরের দেহান্তের অব্যবহিত পরেই তাঁহার কাঁকুড়গাছির বাগানে "কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান" নামে তিনি একটী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে সাময়িক বক্তৃতা, চিন্তা, আলোচনার মধ্য দিয়া দক্ষিণেশ্বরের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয়। অদ্যাপি এখানে ঠাকুরের নিত্য সেবা এবং ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন অষ্টাধিক শত উপকরণ দ্বারা সেবা প্রচলিত আছে। ঠাকুরের দেবদেহের ভস্মাবশেষ বরাহনগর হইতে এইখানে আনিয়া সমাধিস্থ করা হইয়াছিল; বেলুড়ের সমাধি ইহার অনেক পরে মন্নোনীত ও সাধিত হয়।

ঠাকুরের স্ত্রী ভক্তগণের বিবরণ বিশেষ কিছু আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে উপস্থিত দিতে না পারায় দুঃখিত ও লজ্জিত; তাঁহার কৃপা থাকিলে, ভবিষ্যতে চেষ্টা পাওয়া যাইবে। শ্রীশ্রীমা বাগবাজারস্থ উদ্বোধন কার্য্যালয় গৃহে বাস করিতেন এবং তৎকালে বহু ভক্তগণকে ইষ্টমন্ত্র, উপদেশ ও সাধনাদি দান করিয়া দক্ষিণেশ্বরের নিত্য সম্পদ অজস্র বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এই "রামকৃষ্ণ মিশনেরই" কর্ণধারগণের অন্যতম, আমেরিকায় স্বামিজী প্রবর্ত্তিত শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার প্রধান পুরোহিত শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামিজীর পরিকল্পনায় গত ১৩২৮ সনে "রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি" নামক একটী শিশু প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। ইতিমধ্যে দার্জ্জিলিঙে ইহার একটী শাখাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পত্রিকাদি নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ইহার প্রসার নিত্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ঠাকুরের চিহ্নিত সেবকগণের দ্বারা এইরূপে বৃহত্তর দক্ষিণেশ্বরের কার্য্য সাধিত হইতেছে, আমরা দেখিতে পাই।

আজকাল দক্ষিণেশ্বর গ্রামে "রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ" নামক নূতন একটী অনুষ্ঠান হইয়াছে। পরমহংসদেবের ভক্ত অন্নদাঠাকুর ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এখানকার উদ্দেশ্য গৃহে গৃহে শ্রীশ্রীআদ্যা মায়ের পূজা প্রবর্ত্তন করা। এখানেও প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিনে উৎসব ও প্রসাদাদি বিতরণ উপলক্ষে বহু ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে।

এইবারে ভবিষ্যতের মুক্তাকাশে বৃহত্তর দক্ষিণেশ্বরের সম্পূর্ণরূপটীর সন্ধানে আমাদের অনির্দ্দেশ যাত্রা।

ইদং কর্ম্মফলং নারায়ণমর্পনমস্তু।

অর্থাৎ

জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

ওঁ নমঃ ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

সম্পূর্ণ